তত্ত্ব-পরিমল।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষা-
মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং
প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥
—মনু।

14. APR. 98
(114)

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল-প্রণীত।
২১০/৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

১৮৯৮।

Kasi Chan... Ghosal

কলিকাতা,
১/১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত যন্ত্রে
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাঁগ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪।

মূল্য ।৹ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপাসনা-প্রসঙ্গ	১
সত্যস্বরূপ	৫
জ্ঞানস্বরূপ	১১
অনন্তস্বরূপ	২২
আনন্দস্বরূপ	২৬
মঙ্গলস্বরূপ	৩০
একমেবাদ্বিতীয়ম্	৪৩
পবিত্রস্বরূপ	৪৬
ধ্যান ও প্রার্থনা	৪৯
সমালোচনা	৫১
আরাধনা-ব্যাখ্যা	৫৮
বিবেক	৬২
পাপ	৭০
সন্ধ্যা-সাধন	৮৩
গুরু ও মন্ত্র	৮৯
অবতীর্ণ ব্রহ্ম	১০৭
পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম	১১৬
ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ও জাতীয়ভাব ...	১৪১

তত্ত্ব-পরিমল।

উপাসনা-প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মধর্ম্মে উপাসনা কি? আমাদিগের আত্মা হইতে ভিন্ন, আমাদিগের আত্ম-শক্তির অতীত এক মহান্ পুরুষ, যিনি সর্ব্বদা অসহায় আমরা, আমাদিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত, বিপন্ন আমরা, আমাদিগের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি-কুলের কলহ বিবাদে জর্জ্জরিতহৃদয় আমরা, আমাদিগের সমক্ষে শান্তিসুধা লইয়া দণ্ডায়মান, প্রেমের ভিখারী আমরা, আমাদিগের তৃষিত ও শুষ্ক বাসনায় প্রেমবারি সিঞ্চনে সতত সমুৎসুক। যিনি প্রতিনিয়ত আমাদিগের আত্মাতে থাকিয়া আমাদিগের মধ্যে শক্তি ও সদ্ভাব প্রেরণ করিতেছেন; যাঁহার স্পর্শে মুহূর্ত্তে এমন জীবন লাভ করিতেছি, যাহা অন্য কোন উপায়ে সহস্র চেষ্টা করিয়াও কখন লাভ করিতে পারি না; যাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণে এমন বল ঢালিয়া দিতেছে, যে বল মানুষের সৌহার্দ্দ ও সহানুভূতিতে কখনই লাভ করিতে পারিতাম না; সেই সত্য—মঙ্গল—জ্ঞান—প্রেমময়—অনন্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ও সান্নিধ্য অন্তরে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করাই প্রকৃত উপাসনা।

উপাসনার দ্বিতীয় কার্য্য আশ্রয় ভিক্ষা, পরমাত্মার নিকট

আত্ম-জ্ঞাপন। উপাসনাকালে আত্মা বিশ্বাস করে যে, পরমাত্মা তাহার কথা শুনিতেছেন এবং প্রত্যাশা করে যে, তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। আমরা তখন পরমাত্মাকে আত্মার উপরে তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি।

এই স্থানেই প্রার্থনার উৎপত্তি। পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি হইলে আত্মাতে নব নব আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়; এই সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য আত্মা তখন পরমাত্মার নিকটে আপনার অভাব জ্ঞাপন করে, তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ স্থাপনের জন্য লালায়িত হয়।

উপাসনা কিরূপে করিতে হয়? কি উপায়ে তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া উপাসনা করিতে হয়? কি প্রণালীতে এই মধুর মিলন সংঘটিত হইতে পারে?

প্রকৃত উপাসনার প্রথম ও প্রধান কার্য্য তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করা। যতক্ষণে না তাঁহাকে নিকটে পাইয়াছি, আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম না হইয়াছি, যতক্ষণ তাঁহার সত্তা প্রাণে উজ্জ্বল না হয়, ততক্ষণ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহি-রিন্দ্রিয় সংযত করিয়া স্বীয় অসারতা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। ক্রমে এইরূপ অহংবুদ্ধিকে ক্ষীণ করিতে পারিলে, একটু একটু করিয়া ভগবৎস্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইতে থাকে।

ঈশ্বরের অবস্থিতি ও সান্নিধ্য-বোধ ব্যতিরেকে প্রার্থনা করা অতিশয় ধৃষ্টতা, মহাপাপ।

চিত্তবৃত্তি সমূহকে যথাসাধ্য নিরুদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ব্রহ্ম-শক্তির কার্য্যের উপযোগী করিয়া ব্রহ্মকৃপার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। আমার কিছুই থাকিবে না; আমি সম্পূর্ণ

নিশ্চেষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। তিনি যে ভাবে চালান, সেই ভাবেই চলিতে প্রস্তুত থাকিব; যে পথে লইয়া যান, সেই দিকেই অম্লান বদনে, অকুতোভয়ে চলিয়া যাইব। এই বশ্যতার ভাব, এই দীনতার ভাব, এই অহংজ্ঞান-শূন্যতা ব্যতিরেকে প্রকৃত উপাসনা কখনই হয় না।

সজ্ঞানে তাঁহার সান্নিধ্যে বাস করা, তাঁহার সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করা, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তাঁহার করুণাস্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দেওয়া; ইহাই উপাসনা। এই উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, মুক্তির সোপান, ব্রহ্মলাভের উপায়।

এই ব্রহ্মোপাসনা চারি অঙ্গবিশিষ্ট; উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা। এই চারিটী বিভাগ কল্পিত বিভাগ নহে, ইহার সহিত মানবাত্মার স্বাভাবিক যোগ রহিয়াছে। মানবাত্মার অবস্থা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই উপাসনার এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দীনবাত্মার সম্মুখে উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা এই চারিটী অবস্থা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।

মানবাত্মা সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে। মন প্রতি মুহূর্ত্তে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করিতেছে। সংসারের আপাত মধুর বিষয় সমূহকে নিত্য ও স্থায়ী জ্ঞান করিয়া সুখের লোভে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, সে অনিত্য সুখ লইয়াই ব্যস্ত। এই রূপ চঞ্চল, অস্থির এবং সুখপ্রিয় মনকে এই দিক হইতে ফিরাইয়া নিত্য, চৈতন্য ও শাশ্বত সুখের দিকে লইয়া যাইবার জন্য*

* সংগৃহীত।

যে চেষ্টা, তাহাকেই উদ্বোধন বলা হয়। সংসারের অনিত্যতা, অসারতা, মৃত্যুচিন্তা, অপর দিকে সচ্চিদানন্দময় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা বিধাতা পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে আত্মা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। হৃদয় মন নিয়ত বাসনাতে ডুবিয়া রহিয়াছে, সংসারের অতীত চৈতন্যবস্তুকে সে ধরিতে পারে না, বিধাতা যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিয়ত রক্ষা করিতেছেন, তাহা সে বুঝে না—এই অবস্থাতেই মনকে বার বার বলিতে হয় ;—

"মন ! চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।"

* * *

"গাও হে তাঁহার নাম,
রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম,
ঝরে অবিরত ধারে।"

* * *

"অক্ষয় আনন্দ ধামে চলরে পথিক মন।
পাইবে শাশ্বত সুখ জুড়াবে দগ্ধজীবন।"

* * *

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে"

* * *

"কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।"

* * *

মন উদ্বুদ্ধ হইলে সে সহজেই জানিতে চাহে, যিনি ইহ-

সংসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি নিয়ত অন্ন জল দিয়া রক্ষা করিতেছেন, যিনি এই আত্মার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রেরণ করিতেছেন, যিনি এই অনন্ত সৃষ্টির রচয়িতা, তিনি কি পদার্থ? মন উদ্‌বুদ্ধ না হইলে এইরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যখনই আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়, তখনই আরাধনা আরম্ভ হইয়া থাকে। তখনই ভক্ত দেখিতে পান, যাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন প্রাণ লালায়িত হইয়াছে, তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। তখন পরব্রহ্মের এক একটী স্বরূপকে এক একটী অমৃত সাগর বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয়। এক একটী স্বরূপের ভিতরে ডুবিয়া সাধকের মন এক অভূতপূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের এক একটী স্বরূপ পরম তত্ত্বের উৎস স্বরূপ। এক একটী স্বরূপ আলোচনা করিলেই দর্শনশাস্ত্র, তত্ত্বশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র আলোচিত হয়। অতএব পরব্রহ্মের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই মধুময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

সত্যস্বরূপ।

তিন প্রকারে ব্রহ্মসত্তা মানবের গোচরীভূত হইয়া থাকে। ইতিহাস, জড়জগৎ এবং মানবাত্মার অভ্যন্তরে—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" আত্মার অভ্যন্তরে তিনি সত্যং, ইতিহাসে তিনি শিবং এবং জড়জগতে তিনি সুন্দরং। এই সত্যং, শিবং এবং সুন্দরং তিন রূপে দর্শন করাই ব্রহ্ম

সাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মার ভিতরে "প্রাণস্য প্রাণং" রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, জনসমাজের মধ্যে লীলাময়রূপে এবং সৃষ্টিরাজ্যে সুন্দররূপে দর্শন করা অসম্ভব। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে আত্মার মূলে প্রবেশ করিয়া সত্যস্বরূপ সাধন করা কর্ত্তব্য। সত্যস্বরূপ সাধন না হইলে আর কোনও স্বরূপই সাধন হয় না।

সত্য কোথায়? দেখিতেছি, সকলই চঞ্চল। যেখানে সমুদ্র ছিল, সেখানে পর্ব্বত হইয়াছে, পর্ব্বত সমুদ্রে পরিণত হইতেছে। মানুষ বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থায় উপনীত হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রত্যেক মানবদেহের পরমাণু কয়েক বৎসরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত এবং রূপান্তরিত হইতেছে। অতএব এই পরিবর্ত্তনশীল—মরণশীল—সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইবার ভূমি কোথায়? আশ্রয় করিবার অবলম্বনযষ্টি কোথায়? এমন ভূমি কোথায় আছে, যাহা প্রকৃতির সহিত রূপান্তরিত এবং পরিবর্ত্তিত হয় না? জীবাত্মাই সেই অপরিবর্ত্তনীয় স্থায়ী বস্তু।

"আমি" উপাধিবিশিষ্ট অশরীরী চৈতন্যরূপী বস্তুই মানবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, আমি কি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছি, রূপান্তরিত হইতেছি—কি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছি?

"আমি আছি" এই জ্ঞানই আমার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমি শৈশবে যে "আমি" ছিলাম, এখনও সেই "আমি" আছি। আমার মধ্য দিয়া শোক, দুঃখ, বিষাদ এবং

আনন্দকর বহু ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে; কিন্তু আমার মৌলিক পরিবর্ত্তন—আমিত্বের পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই।

এই আত্মা দ্বিবিধ জ্ঞানসমন্বিত। প্রথম মৌলিকজ্ঞান, দ্বিতীয় আগন্তুক জ্ঞান। আমি নীল রঙ্গ দেখিলাম, পরে শুভ্র দেখিলাম; এই যে একটীর পর আর একটী দর্শন, ইহাকেই আগন্তুক জ্ঞান বলে। কেবল আত্মাতে স্মৃতিরূপ চিহ্ন রাখিয়া এ সকল জ্ঞান চলিয়া যাইতেছে। আর একরূপ জ্ঞান আছে, তাহা মৌলিক জ্ঞান। অর্থাৎ আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি—এই যে দ্রষ্টা, শ্রোতা এবং কর্ত্তারূপী আমি এবং আমার জ্ঞান, ইহাকেই সাক্ষী জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানই অপরিবর্ত্তনীয়। এই জ্ঞানই ভূত কালের সহিত বর্ত্তমানের সংযোগ-স্থাপন করে, এই জ্ঞানই স্মৃতিকে রক্ষা করে, এই জ্ঞানই সমুদয় শৃঙ্খলার মূল কারণ। এই স্থানেই মানবাত্মার অপরিবর্ত্তনীয়-সত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই মানবাত্মা অমর। যিনি বাহিরের ঘটনাদ্বারা পরিবর্ত্তিত হন না, অথচ ঘটনারাজির শৃঙ্খল যিনি রচনা করেন, তিনি অপরিবর্ত্তনীয়।

এই যে "আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি," এই যে "সাক্ষীজ্ঞানরূপী আমি"—এই 'আমি' যদি পরিবর্ত্তনশীল হইত, তবের কল্যকার চিন্তা ও কার্য্যের সহিত অদ্যকার চিন্তা ও কার্য্যের সংযোগ থাকিত না। 'আমি' চিন্তায়, কার্য্যে এবং ধারণায় প্রত্যেক বিষয়েই পরিবর্ত্তিত হইত। তাহা হইলে মানব জীবনই সংরচিত হইত না। কিন্তু বিশ্ববিধাতা মানবাত্মাকে অজরা

ময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই পরিবর্ত্তনশীল জগতের ন্যায় তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

একজন পশ্চিমদেশীয় সাধু বলিয়াছেন, "আমরা সচরাচর যাহাকে মানুষ বলি, যে মানুষ আহার করে, পান করে, কৃষিকার্য্য করে, কেরাণীগিরি করে, সে মানুষ দেখিলে প্রকৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং পরিচয়ের ব্যাঘাত হয়। সে মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি না; কিন্তু সেই মহান্ আত্মা অর্থাৎ মানুষ যাহার যন্ত্রস্বরূপ, যদি মানুষ তাঁহাকে নিজ কার্য্যে প্রকাশ হইতে দেয়, তবে তাঁহাদের নিকট আমাদের মস্তক অবনত হয়। এই মহান্ আত্মা যখন মানবের বুদ্ধিদ্বারা প্রবাহিত হয়, তখন সেই বুদ্ধি প্রতিভার আকার ধারণ করে; যখন ইচ্ছাতে অধিষ্ঠান করে, তখন সাধুতারূপে প্রকাশ পায়; যখন হৃদয়কে আশ্রয় করে, তখন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়।"

রাম অজ্ঞানী ছিল, ক্রমে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে; অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইয়াছে; পাপে মগ্ন ছিল, পুণ্যের দিকে মুখ ফিরিয়াছে। এই সকল ঘটনাতে আত্মার মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। মানবাত্মা স্বীয় সুদৃঢ় অস্তিত্বে অচল অটল থাকিয়া নিয়ত উন্নত রাজ্যে গমন করিতেছে।

সাধক এই অনিত্য, বিনাশশীল জগতে এই স্থানেই প্রথমে স্থির ভূমি দেখিতে পান, এবং এই আত্মাকে জানিতে গিয়াই পরম সত্য পরব্রহ্মের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করেন। যেমন ঘটনাকে জানিতে গেলেই অপরিহার্য্যরূপে কালের জ্ঞানোদয় হয়, এবং জড়বস্তু জানিতে গেলেই অপরিহার্য্যরূপে আকাশের জ্ঞান হয়, সেইরূপে স্বীয় আত্মাকে জানিতে

গেলেই আত্মার আধাররূপী, আশ্রয়দাতারূপী পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয়।

আত্মজ্ঞানের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, স্মৃতি ও বুদ্ধিঘটিত জ্ঞান লাভ করা মানবের ইচ্ছায়ত্ত নহে। পূর্ণতোয় সাগর যেমন নদী ও খাল বিলে জল প্রেরণ করে, অথচ সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তেমন এক অক্ষয়, অবিনাশী, সত্যামৃত ভাণ্ড হইতে মানবাত্মার মূলে রস সঞ্চারিত হইতেছে, তাঁহাতেই আত্মা জীবিত ও কর্ম্মক্ষম। মানব যখন নিদ্রিত হয়, তখন কে তাহাকে জাগ্রত করে? কেহ কি ইচ্ছা করিয়া চৈতন্য লাভ করিতে পারেন? অচৈতন্য অবস্থায় চৈতন্য আনয়ন করিতে মানবশক্তি অসমর্থ। পরন্তু মৌলিকজ্ঞান মানব আনয়ন করিতে পারেই না। মৌলিক জ্ঞান ভিত্তি-স্বরূপ আছে বলিয়া অপরাপর জ্ঞান লাভ হয়। মানুষ ভাবিতে পারে, আলোচনা করিতে পারে, ধারণা করিতে পারে, এ সকল জ্ঞানের কার্য্য বই কি? কিন্তু যে জ্ঞান হইতে এ সকল জ্ঞান কণিকার উদ্ভব হয়, সেই মৌলিক জ্ঞান মানুষ আনয়ন করিতে পারে না। এই মৌলিক জ্ঞানের সহিত পরমজ্ঞান-বান্ ঈশ্বর নিত্যযুক্ত রহিয়াছেন।

মানব যেমন স্মৃতিশক্তিঘটিত জ্ঞান স্বয়ং আনয়ন করিতে পারে না, তেমনি প্রেম পবিত্রতাও উৎপন্ন করিবার মানুষের অধিকার নাই। সেই পূর্ণাধার পরমেশ্বর হইতে সকল মহৎভাব মানবাত্মায় নিরন্ত প্রেরিত হইতেছে। তিনি আত্মার আধার, আত্মা আধেয়; তিনি আশ্রয়, মানব আশ্রিত; তিনি দাতা, মানব গ্রহীতা; তিনি পিতা, মানব পুত্র। পরমেশ্বরের সহিত

মানবাত্মার এই যে মধুর সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ আত্মার মূলেই কেবল অনুভব্য। পরব্রহ্মের সহিত মানবাত্মার অনন্ত কালের যোগ। এই অস্থি মাংসময় শরীরের সহিত মানবাত্মার ইহ-কালের সম্বন্ধ মাত্র। যখন দেহ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইবে, তখন রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ কোথায় থাকিবে? তখন আত্মা সেই অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রেম পুণ্যে সঞ্জীবিত থাকিয়া অনন্তকাল তাঁহার সহবাস-সুখ অনুভব করিবে। সুতরাং মানবাত্মার অভ্যন্তরে যে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি, তাহাই অনন্ত কাল-স্থায়ী ব্রহ্মযোগ।

যাহার অন্তরে সত্যসাধন হইয়াছে, তিনি প্রজ্ঞা চক্ষুদ্বারা যেখানে দৃষ্টি করেন, সেখানেই পূর্ণস্বরূপ ভগবানকে দেখিতে পান। তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাতেই প্রাণেশ্বরের স্পর্শ সুখ অনুভব করেন, যাহা আলোচনা করেন, তাহাতেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রকাশিত দেখিতে পান। তাঁহার অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মময় ভূমণ্ডলে তিনি বাস করেন। তখন শয়নে, ভ্রমণে, চিন্তায়, কার্য্যে, অধ্যয়নে সকল সময়েই তাঁহার ব্রহ্মযোগ হয়। এই অবস্থা লাভই সত্যস্বরূপ সাধনের উদ্দেশ্য।

উদ্বোধনের পরে সাধনার্থী অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করি-লেন। তিনি চক্ষু মুদিলেন, বাহ্য দৃশ্য তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইল। তখন রহিল অন্ধকাররাশি। তখন সাধকের নিকট আর কিছুই রহিল না, কেবল অন্ধকার—অন্ধকার। তিনি সকল চিন্তা, সকল দৃশ্য হইতে মনকে ফিরাইয়া অন্ধকারে ডুবি-লেন। আত্মা বিষয়ীরূপে বিদ্যমান, অন্ধকার তাঁহার বিষয়

হইল। তৎপর অন্ধকার তিরোহিত হইল, "সত্যং" প্রকাশিত হইলেন। আত্মা ব্রহ্মসত্তারূপ আকাশে বিচরণ করিতেছে। চারিদিকে ব্রহ্ম, 'সত্যং' ভিন্ন আর কিছুই নাই। উর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দ্দিকে ব্রহ্ম, আকাশে ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্মময়। "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।"

সাধক যখন এইরূপে সত্য পুরুষের সহিত প্রাণের যোগ অনুভব করেন, তখন আর তাহার সংশয় অন্ধকার থাকে না। তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব অনুভব করেন এবং ব্রহ্মীভূত হইয়া যান। এই অবস্থা যে কি, তাহা আত্মাই জানিতে সক্ষম ; কিন্তু ভাষা ব্যক্ত করিতে পারেনা।

জ্ঞানস্বরূপ।

"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই বেদবাক্য মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বোধোদয়' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। এই পৌত্তলিকতাপূর্ণ দেশে এই মহামন্ত্র না জানি কত বালক বালিকার প্রাণে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত করিয়াছে ! কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, তদীয় উত্তরাধিকারিগণ এই মহাবাক্যটী উক্ত পুস্তক হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন।

"ঈশ্বর নিরাকার" কিরূপে বুঝিব ? আমরা নিয়ত সাকার বস্তুর সহিত পরিচিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দই আমাদের অবলম্বন, নিরাকার বস্তুর সহিত কোথায় সাক্ষাৎ পাই ? প্রকৃত কথা কিন্তু অন্যরূপ। আমরা নিরাকারই প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারি, সাকারকে প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারি না। বিষয়টা একটু চিন্তার সহিত আলোচনা করা যাউক।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমুদায় সাকার বলিয়া অভিহিত। ঈদৃশ সাকারের অস্তিত্ব আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন করি, নাসিকাদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করি, হস্তদ্বারা স্পর্শ করি এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি। অতএব আমরা জড়কে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সমষ্টি বলিয়াই জানি। অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাই রূপ; রসনার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই রস; নাসিকার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই গন্ধ; ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই স্পর্শ; আর কর্ণের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ। বিশেষরূপে চিন্তা করিলে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শবোধ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদের জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জড়বস্তুর নাই। জড়জ্ঞান বিষয়রূপে প্রকাশিত, সুতরাং জ্ঞানাধীন, জ্ঞানের আশ্রিত এবং জ্ঞানকর্তৃক পরিধৃত। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ আত্মা জড়কে জানিতেছে, ইহাতেই জড়ের অস্তিত্ব প্রকাশিত। সুতরাং জ্ঞানই প্রকৃত সত্তা। আমরা সাকারকে জ্ঞানদ্বারাই উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবে আর সাকারের মৌলিকত্ব রহিল কোথায়? নিরাকারের সত্তাই প্রতিষ্ঠিত।

আমি কি? এই যে আমি চিন্তা করিতেছি, লিখিতেছি, এই আমি কি পদার্থ? আমার হস্ত আমি নহি, পদ আমি নহি, মস্তিষ্ক আমি নহি। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার। এই দেহ আমার। এই দেহের মধ্যে আমি কোথায় বাস করি? এই দেহের মধ্যে এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে আমি বাস

করি আমার রূপ কি? আমি ত্রিকোণ কিম্বা চতুষ্কোণ নহি, চ্যাপটা নহি, গোল নহি, আমার কোনও আকার নাই। এই আমিই জ্ঞানময় আত্মবস্তু। আমি নিরাকার চেতনাবিশিষ্ট আত্মা। আমি আমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না, চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারি না, অথচ আমি আছি। আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহি।

"আমি আছি" এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের মূলজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান। ইহার মত প্রত্যক্ষ সত্য আর কি আছে? কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর স্বীয় সাদৃশ্যে মানবাত্মাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন," ইহা অতি সত্য কথা। মহান্ পরমেশ্বর, জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার। তিনি এই সান্ত অসম্পূর্ণ আত্মাকে স্বীয় স্বরূপের অনুরূপ কিছু কিছু জ্ঞান প্রেম পুণ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবাত্মা নিরাকার চৈতন্যপদার্থ, এই নিরাকার চৈতন্য পদার্থকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি সাকার হইতে পারেন? সাকার বস্তু কেবল বিষয়রূপেই প্রকাশিত, তাহার কোন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব নাই।

সংক্ষেপে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, "সাকারকে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু নিরাকারকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, প্রত্যক্ষ করা যায় না," ইত্যাদি কথা যে প্রচলিত আছে, তাহা অযৌক্তিক। জ্ঞানের বিষয়রূপেই সাকার প্রকাশিত এবং নিরাকার চৈতন্য পদার্থই প্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং সাকারকে জানিতে গিয়া, আমরা নিরাকারকেই নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সাকারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ আছে। ঈশ্বর যদি

সাকার হইতেন, তবে তিনিও বিনষ্ট হইতেন। সাকার বস্তু কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানেই থাকে, ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী হইতে পারিতেন না। সাকারবস্তু সীমাবদ্ধ, যতই বৃহৎ বস্তুর কল্পনা কর না কেন, সাকার বলিলেই সীমাবিশিষ্ট বুঝাইবে. ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি অনন্ত ও অসীম হইতে পারিতেন না। সাকার বস্তুর ইচ্ছা মত গমনাগমন করিবার শক্তি নাই, ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি সর্ব্বদর্শী হইতে পারিতেন না। সাকার বস্তু অন্যদ্বারা চালিত, কিম্বা অন্য দ্বারা অনুভূত, তাহার নিজের কোনও শক্তি নাই; ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময় হইতে পারিতেন না।

আমরা যেমন এখন দেহে বাস করিতেছি, তেমনি তিনি কোন দেহে বাস করেন, এরূপও নহে, কেন না তাহা হইলে তিনি দেশ কালে আবদ্ধ হইতেন। পরমেশ্বর দেশ কালের অতীত। সাকার অনিত্য ও অস্থায়ী; অনিত্য ও অস্থায়ী যাহা, তাহা ঈশ্বর নহে। শিশুগণ যেমন তাহাদের খেলিবার পুতুলকে জীবন্ত ভাবিয়া থাকে, তেমনি অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরকে দেহধারী জীব বলিয়া মনে করে।

মানবাত্মা নিরাকার চৈতন্যবস্তু। সত্যস্বরূপ সাধন করিলেই সাধক দেখিতে পান, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ। নিরাকারের সহিত নিরাকারের যোগ, চৈতন্যের সহিত চৈতন্যের যোগ, আত্মবস্তুর সহিত পরমাত্ম বস্তুর যোগ। এই যোগেই ব্রহ্মস্বরূপ সাধক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সাধক দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞান, প্রেম,

আনন্দ, শান্তি এবং পবিত্রতার বীজ রহিয়াছে, তাহা সেই পরব্রহ্মেরই প্রতিকৃতি-স্বরূপ। এই আত্মজ্ঞানের মূলেই ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত।

আমরা জগতেও তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাই। মানবের জীবনে, ইতিহাসে, জড়জগতে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের লীলা দর্শন করি। ঐ বাবুইর বাসাটী দেখ, কেমন সুন্দর, উহাতে কেমন শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে! কোন ব্যক্তি বিশেষরূপে শিক্ষা না করিলে ঐরূপ সুন্দর বাসা প্রস্তুত করিতে পারেন না। বাবুই কখনও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করে নাই, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, কেহ উহাকে দেখাইয়াও দেয় নাই, তবে সে কিরূপে এমন সুন্দর বাসা প্রস্তুত করিতেছে? প্রত্যক্ষরূপে এক জ্ঞানময়ী শক্তি ঐ বাবুইর ভিতরে রহিয়াছে, সেই শক্তিই ঐ সুন্দর বাসাটি প্রস্তুত করিয়াছে।

একবার মধুচক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মধুচক্র কেমন সুন্দর, কেমন সুকৌশলে নির্ম্মিত। ষড়ভূজ এক একটী গর্ত্ত, যেন কোনও দক্ষ শিল্পী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত প্রস্তুত করিয়াছেন। এই যে অদ্ভুতশিল্পনৈপুণ্য-পরিচায়ক মধুচক্র, অবোধ মধুকরগণ কিরূপে ইহা নির্ম্মাণ করিল? মধুকরদিগের মধ্যে এক জ্ঞানময়ী শক্তি থাকিয়া তাহাদিগের দ্বারা মধুচক্র নির্ম্মাণ করাইতেছে।

সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, যখনই তাহাদের ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী খালের মধ্যে, যেখানে অন্যান্য জীবভুক্ প্রাণী নাই, এমন নিরাপদ স্থানে গিয়া ডিম পাড়ে। এই যে সন্তান বাঁচাই-

বার জন্য নিরাপদ স্থানে গমন, ইহাতে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা জ্ঞানময়ী শক্তিরই কাজ।

এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কোথায় থাকে, কেহ জানে না; কিন্তু প্রতি বৎসর ঠিক এক দিনে—এক সময়ে সেই সকল পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট একটি বাগানে উপস্থিত হয়, তৎপর বাসা প্রস্তুত করিয়া ডিম পাড়িয়া থাকে। তাহাদের আগমন এমন নির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত যে, সেই স্থানের লোকেরা সেই দিন ধরিয়া পঞ্জিকার গণনা আরম্ভ করে। সেই পক্ষীদিগের সঙ্গে ঘড়ি নাই, সময় নিরূপণ করিবার কোনই যন্ত্র নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহারা সময় ঠিক করে না, তবে এরূপ সুনিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিয়া তাহারা প্রতি বৎসর কি রূপে একই স্থানে আগমন করে? ঐ জ্ঞানময়ী শক্তি তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া পরিচালন করিতেছে।

গমনশীল জাহাজের নাবিকগণ কোনও চরভূমিতে উপস্থিত হইলে নানাবিধ ফল দেখিতে পায়; কিন্তু যে সকল ফল পক্ষীতে ভোজন করিয়াছে বলিয়া তাহারা প্রমাণ পায়, সেই সকল ফলই নাবিকগণ ভোজন করিয়া থাকে। কেন না কোন্‌টী বিষফল, কোন্‌টী ভাল ফল, তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন্‌টী বিষফল, কোন্‌টী ভাল ফল, তাহা পক্ষিগণ কি করিয়া জানিল? কোনও পাখী একটী ফল ভক্ষণ করিয়া মারা গেল, অমনি অন্যান্য পক্ষিগণ উহা বিষফল বলিয়া জানিল এবং সতর্ক হইল, এমন ত হয় না। তাহারা দেখিয়া, আঘ্রাণ লইয়াই ঠিক করে কোন্‌টী তাহাদের খাদ্য। আমরা

দেখিয়াছি, ঘাসের মধ্যে বিষ-গন্ধ থাকিলে তৃণভুক্ জন্তুগণ উক্ত বিষগাছ বাদ দিয়া ভাল ঘাস ভোজন করে। এই যে খাদ্যাখাদ্য বিচারশক্তি এবং গ্রহণ ও বর্জ্জনের ভাব, ইহারই মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক দেখা যায়। জ্ঞানময়ী শক্তি পশু পক্ষীদিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছে। তাহাদিগকে কেহ শিক্ষা দেয় না, তাহারা স্কুল কলেজে পড়ে না, তাহারা সেই জ্ঞানময় ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত।

শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া কি ভোজন করিবে, পূর্ব্বেই তাহার আয়োজন হইল! শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, জননীর স্তনে ক্ষীর সঞ্চারিত হইল। যিনি অভাব জানিয়া পূর্ব্বেই আয়োজন করেন, তিনি কি জ্ঞানময় নহেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎদৃষ্টি জ্ঞানের একটী লক্ষণ—যেখানে ভবিষ্যৎ ভাবনা দেখা যাইবে, সেখানেই জ্ঞানের সত্তা অনুভূত হইবে।

যদি এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরস্পর কেমন সম্বন্ধযুক্ত! একটীর সহিত আর একটীর কেমন ঘনিষ্ঠতর—নিকটতর যোগ। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে অবস্থিত, এই সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর অতি নিকট সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কে স্থাপন করিয়াছেন? সূর্য্য নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, সে জড় পদার্থ, সে জানে না কি জন্য ভ্রমণ করিতেছে। কে তাহাকে ভ্রমণ করাইতেছে? বৃক্ষ লতাদি জন্মিতেছে, ইহার মূলে কে? এক মহা জ্ঞানময়ী শক্তি ইহার মূলে কার্য্য করিতেছে। চেতনে চেতনে, জড়ে জড়ে সংযোগের মধ্যে সেই জ্ঞানময়ী শক্তির পরিচয় পাই। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, জোয়ার ভাটা, জল অনল, বায়ু,

মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞানময় পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া, ইহাদিগকে কার্য্যে ব্যবহৃত করিতেছেন।

সৃষ্টির মধ্যে আমরা মহাশক্তি সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইতে দেখিয়া আমরা, অনুভব করি যে, কি এক ভয়ানক শক্তির কাজ হইতেছে। আমাদের মধ্যে শক্তি আছে, এই জন্যই আমরা জগতের মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হই। কেহ কেহ বলেন, "ভিতরে শক্তি অনুভব করিতেছি সত্য; কিন্তু বহির্জগতে যে শক্তি আছে, তাহা কিসে প্রমাণিত হয়? কেবল আমার ভিতরে শক্তি দেখিয়া জগতে শক্তির আরোপ করি কেন? কেবল নিজ অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অন্য স্থানে প্রত্যক্ষ করি নাই, তবে কেন অন্য স্থানে শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব?" ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, "তুমি বিশ্বাস না করিয়া পার না, এই জন্যই বিশ্বাস কর। শক্তিতে বিশ্বাস, স্বাভাবিক বিশ্বাস। মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, ভিতরে যাহা অনুভব করে না, তাহা অন্যত্রও অনুভব করিতে পারে না।"

শক্তি পদার্থ না পদার্থের গুণ? শক্তি পদার্থ নহে। শক্তি বলিলেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, "কার শক্তি?" শক্তি অর্থ ক্ষমতা, কার ক্ষমতা? তাহা হইলেই কোনও বস্তু বা পদার্থের গুণ স্বীকৃত হইল। বাস্তবিক শক্তি আত্মার গুণ। শক্তিকে আমরা গুণরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যদি বল, "জলেতে বায়ুতে, অনলে শক্তি আছে", তবে ইহাই বলা হইল যে, সে সে স্থলে আত্মা আছে। এই শক্তির মধ্যে তিনটী গুণ দেখা যায়।

সেই গুণ এই, জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা। জ্ঞান—সত্যকে ধারণ করা; ভাব—সুন্দর কি কুৎসিৎ এবং সুখ দুঃখাদি অনুভব করা; ইচ্ছা—বাসনা ও কর্ত্তৃত্ব। শক্তি বলিলেই এই সকলকে বুঝায়। সুতরাং শক্তি আত্মবস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই আমাদের অন্তর নিহিত শক্তিতে আত্মবস্তুকে দেখিয়া জগতের শক্তিতেও পরমাত্মার সত্তা অনুভব করি।

যেমন অগ্নি সকল স্থানে একই পদার্থ, যদি কেহ মঙ্গল গ্রহে অগ্নি দেখেন, তবে যেমন আমরা উহাকে এখানকার অগ্নির সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিব, তেমনি শক্তি যে আত্মবস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে, অন্তরে তাহার পরিচয় পাওয়াতে বাহিরের শক্তিকেও আত্মবস্তু বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিয়া থাকি। কোনও স্থানে জল আছে বলিলেই এই জলের মত বুঝিতে হইবে। যখন শক্তিকে আত্মার ভিতরে জ্ঞানময়রূপে দেখিতেছি, তখন অন্যত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই তাহা জ্ঞানময়ী শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শক্তির একটী ভাব এই—কোনও কার্য্য করা। যখন বলি "আমি করিতেছি," তখন ইহা জানি যে, আমিই করিতেছি। কেহ কি বলিতে পারেন যে, তিনি কিছু করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা জানেন না? করা অর্থই জ্ঞাতসারে করা। যদি সম্পূর্ণ সুষুপ্ত অবস্থায়, অজ্ঞান অবস্থায়, আমার দ্বারা কোন কাজ হয়, তাহা আমার কাজ বলিয়া স্বীকার করিব কি? ইহাই বলিব যে, "আমাকে অজ্ঞান করিয়া কেহ কাজ করাইয়াছে।" আমি কিছু জানি না, অথচ কাজ করিলাম, ইহা

অসম্ভব। কর্ম্ম বলিলেই জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শক্তি বলিলেই স্বীকার করিতে হইবে যে, কেহ কিছু করিতেছে। এই জন্যই জ্ঞানের সহিত শক্তির যোগ অভিন্ন।

কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জগতের ঘটনাশৃঙ্খল দর্শনে যে জগৎকারণ, জগৎকর্ত্তা অনুমিত হন, তাহা নহে; প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎকারণ প্রত্যক্ষ হইতেছেন। যাহাকে কার্য্যকারণশৃঙ্খল বলা যায়, তাহা অচ্ছেদ্য জ্ঞানযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোনও অপারবর্ত্তনায় জ্ঞানযোগে যুক্ত না থাকিলে, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ থাকে না, এবং এই নিয়মও সম্ভব হয় না। কার্য্য কারণের মধ্যে যে জ্ঞানযোগ রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

আমরা যখন আত্মার মূলে প্রবেশ করি, তখন দেখিতে পাই একজন জ্ঞানবান পুরুষ নৈতিক শাসনকর্ত্তারূপে বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সত্য, প্রেম, এবং পবিত্রতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। ভাল ও মন্দ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, পাপ এবং পুণ্য এই দুইটী পথ রহিয়াছে। এই দুই পথের কোন্ পথে মানবকে গমন করিতে হইবে, তাহা মানবকে কে বলিয়া দিতেছেন? মানব-হৃদয়ে পাপ এবং পুণ্যে দিবা রাত্রি দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে, সেই যুদ্ধে দেবত্ব জয়লাভ করিতেছে এবং মনুষ্যত্ব পরাজিত হইতেছে। এইরূপে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহার মূলে কে? জনসমাজ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মে, জ্ঞানে উন্নতির পথে গমন করিতেছে, কেন? পাপ, অধর্ম্ম এবং অবিচারের রাজত্ব কেন প্রতিষ্ঠিত হয় না?

IMPERIAL

অন্যায় কাজ করিলে কে যেন প্রাণের মধ্য হইতে ভয়ানক শাসন করে। ছয় বৎসরের বালক থিওডার পার্কার কচ্ছপ দেখিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল "ছি, ছি, তুমি কি করিতেছ? এই নির্দ্দোষ জীবটীকে কেন প্রহার করিতেছ?" এই যে শাসনকর্ত্তারূপে, গুরুরূপে, উপদেষ্টা রূপে এক জন আত্মার মূলে উপবিষ্ট আছেন, ইনি কে? ইনিই জ্ঞানময় পুরুষ। বিবেক, বুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের ভিতর দিয়া আমরা পরব্রহ্মের আদেশ ও উপদেশ লাভ করিয়া থাকি। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় নূতন নূতন আদর্শ তিনিই আমাদের সম্মুখে আনয়ন করেন। তিনিই ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আমাদের নিকট প্রকাশিত করেন। সেই জ্ঞানময় শিক্ষক, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র সকলের হৃদয়েই আছেন। যিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন।

আমি কিছুই ছিলাম না। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিলেন। এক বিন্দু রক্তের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। তিনি এক বিন্দু রক্ত লইয়া যেন বলিলেন "ইহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য সমন্বিত আত্মা হউক" অমনি আমি হইলাম। যিনি জগতে এই অত্যদ্ভুত লীলা করিতেছেন, তিনিই পরম জ্ঞানময় পরব্রহ্ম।

তিনি নৈতিক দণ্ডদাতারূপে, নূতন আদর্শ প্রকাশকরূপে এবং ধর্ম্মাবহ পাপনুদরূপে মানবাত্মার মূলে অধিষ্ঠিত। ভ্রমান্ধ লোকে বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি বাহিরের শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে; কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, এই খানেই

সকল শাস্ত্রের মূলশাস্ত্র, সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান। সকল উপদেষ্টা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা পরম প্রভু জ্ঞানময় পরব্রহ্ম বিরাজিত। ব্রহ্ম সাধকের শাস্ত্র ও গুরু বাহিরে নহেন, অন্তরে।

"কারে বল্‌ব রে, কেবা কর্‌বে রে প্রত্যয়,
এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।"

জ্ঞানদাতা, শাস্ত্রকর্ত্তা, ধর্ম্ম ও নীতি-প্রচারক পরমেশ্বর মানব অন্তরে বাস করিতেছেন। আবার যিনি ভিতরে, তিনিই বাহিরে। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, বাহিরে তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অনন্তস্বরূপ।

অনন্ত কি? যাহার সীমা নাই, যাহার সীমা ভাবিতে পারি না, তাহা অনন্ত; যাহার আদিও নাই, শেষও নাই তাহা অনন্ত; যাহা পূর্ণ, অখণ্ড, তাহাই অনন্ত।

সীমা নির্দ্দেশের সহিতই আমাদের অনন্তের জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। 'সসীম' বলিলেই 'অসীম' যে আছে, তাহা বুঝায়। এইরূপে অনন্তে বিশ্বাস মানবের স্বাভাবিক। এই উপায়ে এই সসীম জগৎ দর্শন করিয়া আমরা অসীমের ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আরও সূক্ষ্ম তত্ত্বে যখন মানব-মন উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায় যে, দেশ এবং কাল অনন্ত হইয়া সেই অনন্ত মহান্ পরব্রহ্মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দেশ ও কাল অনন্ত,—কি প্রকারে? এ বাড়ী ও বাড়ী, ইহার মধ্যস্থিত শূন্য স্থলকে আকাশ বলে। তেমনি সূর্য্য এবং পৃথিবী ইহার মাঝখানে যে ব্যবধান তাহা আকাশ নামে উক্ত হয়। আকাশ অর্থ শূন্য স্থান, অর্থাৎ যেখানে কিছুই নাই। শূন্যের

নাম আকাশ, এবং যে অংশে গ্রহ উপগ্রহ আছে, তাহাকে স্থান কহে। এই স্থান ও আকাশের সাধারণ নাম দেশ। এই দেশের সীমা আছে কি? আচ্ছা, একবার কল্পনা করি যেন এই বহু বিস্তৃত দেশ লইয়া একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহার প্রান্ত-দেশে দাঁড়াইলেও আকাশ থাকিবে, তার পরে গেলে আরও আকাশ, তার পরে আকাশ। এইরূপে কল্পনার রেখা টানিয়া, বৃত্ত টানিয়া, যতই অগ্রসর হইব, সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিকে ততই আকাশ থাকিবে, কখনও আকাশ শেষ হইবে না।

দেশ বলিলেই অনন্ত বুঝায়। এক সীমাহীন অনন্ত—ইহার আরম্ভ নাই, শেষও নাই। যদি বল "সীমা আছে," তাহা হইলে বলিব, এইটী স্ববিরোধী কথা। তুমি যখন বলিবে যে, "সীমা আছে," আমি তখনই অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিব যে তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছ "এই সীমা," সেখান হইতে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর দেখি, দেখিবে আরও দেশ আছে। তবে তোমার সীমা নিরূপণ কোথায় হইল?

দেশ যেমন অনন্ত, কালও তেমনি অনন্ত। কাল অনন্ত কি রূপে বুঝিব? একবার চিন্তা করিয়া দেখি। আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে দণ্ডায়মান আছি। আমাদের পশ্চাতে ও সম্মুখে কোনও কালের রেখা পাত করিতে পারি কি? তুমি কোটি কোটি যুগ যুগান্তর কল্পনা কর, অঙ্ক শাস্ত্রে যত অঙ্ক আছে, তাহা পাত কর, সমুদ্রের মধ্যে যত বালুকাকণা আছে, তত যুগ কল্পনা কর, তোমার যত সাধ্য ততদূর যাও; কিন্তু অগ্রে কি পশ্চাতে, ভূত কি ভবিষ্যতে কোন সীমাই নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না।

আর একটী বিশেষ কথা এই যে, কাল বলিলেই কার্য্য বুঝায়। কার্য্য ভিন্ন কালের ধারণা অসম্ভব। ক্রমশঃ এক একটী ঘটনা ঘটিতেছে, এই ঘটনাসমষ্টির নাম কাল। এই ঘটনার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথম কোনও ঘটনা নাই এবং সর্ব্বশেষের ঘটনাও নাই। কেন না একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা অপরিহার্য্য নিয়মে সংবদ্ধ। এই ঘটনারাশি একটীর সহিত আর একটী কিসের দ্বারা শৃঙ্খলিত? ইহারা জ্ঞান শৃঙ্খলেই সংবদ্ধ।

এই দেশ ও কাল অনন্ত বটে; কিন্তু স্বাবলম্ব ও চৈতন্য-বিশিষ্ট নহে। এই দেশ ও কাল অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তিনি দেশ ও কালের অতীত, অর্থাৎ দেশ ও কালেতে আবদ্ধ নহেন। তিনি যদি অনন্ত না হইবেন, তবে অনন্ত দেশ কালকে কি রূপে আধেয়রূপে রক্ষা করিবেন? যিনি সান্ত তিনি কি অনন্ত সৃষ্টির ধারণকর্ত্তা হইতে পারেন?

জড়ে ও চেতনে আমরা আশ্চর্য্যরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। দুইটী ফুল, দুইটী পাতা, দুইটী বালুকাকণা এক রকম নয়। অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত সৃষ্টি। এই অনন্ত বিচিত্রতা অনন্তস্বরূপেরই সাক্ষ্য দিতেছে। আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেও ঐ বৈচিত্র দেখি। দুইজন মানুষের হৃদয় মন এক রকম নহে। দুই জনের আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি, সুখ দুঃখ এক রকম নহে। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এই বৈচিত্র্যের মূলে প্রবেশ করিলে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আমরা আমাদের আত্মার স্বরূপ চিন্তা করিলে,দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহা অপূর্ণ ; পৃথিবীর অতি সামান্য তত্ত্বও আমরা জানি না। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছিলেন, "আমি শিশুর ন্যায় জ্ঞানসমুদ্রের তীরে কেবল উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, আমার সম্মুখে অনন্ত জ্ঞান-জলধি বিস্তৃত রহিয়াছে।" এই যে আমরা আমাদের জ্ঞানকে অপূর্ণ বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, পূর্ণ জ্ঞান—অনন্ত-জ্ঞানের ভাণ্ডার—আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। যেমন খণ্ড বলিলেই অখণ্ডের ভাব মনে উদয় হয়, সান্ত বলিলেই অনন্তের ভাব উদয় হয়, তেমনি অপূর্ণ ভাবিলেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। অপূর্ণ জ্ঞানের মধ্যেই আমরা পূর্ণ জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করি। অনন্ত দেশের মধ্যে যেমন আমরা খণ্ড দেশ দর্শন করি, তেমনি পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে আমরা অপূর্ণ জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকি। এই পূর্ণ জ্ঞানই অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর। অনন্তেই পূর্ণতা।

মানবপ্রকৃতির গতি অনন্তমুখীন। অনন্তের সহিত মানবাত্মার অচ্ছেদ্য যোগ। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, মানবাত্মা সেই স্রোতে নিমগ্ন হইয়া, অনন্তের দিকে গমন করিতেছে। আমরা যে সৌন্দর্য্য দর্শন করি, তাহাতেও অনন্তের সহিত যোগ হয়। নিত্য নবীনত্ব, অনন্তের একটী লক্ষণ। যতই সৌন্দর্য্য অনুভব করি, ততই সৌন্দর্য্যকে নবীন বলিয়া প্রতীত হয় ; প্রেমাস্পদকে যতই দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়, প্রেম কখনও পুরাতন হয় না ; যতই জ্ঞানালোচনা করি, ব্রহ্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করি, ততই নূতন আলোক

দর্শন করিয়া থাকি। এই নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আনন্দ, নূতন সৌন্দর্য্য অনন্তেরই প্রকাশ। সান্ত পুরাতন, সীমাবদ্ধ ও ব্যবহৃতবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় অনাকাঙ্ক্ষিত। অনন্ত পরব্রহ্মই মানবাত্মার বিহারক্ষেত্র এবং মানব-প্রকৃতির মধ্যেই অনন্ত বিরাজিত আছেন।

আনন্দস্বরূপ।

তিনি আনন্দরূপমমৃতম্। আমরা স্বীয় স্বীয় জীবনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই সুনিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারি যে, তিনি রস-স্বরূপ—তৃপ্তিহেতু। মানব-মন নিয়ত আনন্দলাভের জন্য লালায়িত। যদি আনন্দ বলিয়া কোনও খাটী বস্তু সংসারে না থাকিত, তবে মানব মন আনন্দের জন্য এত ব্যাকুল হইত না।

আনন্দের মূলে দুইটী বিষয় দেখা যায়,—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং নিত্যতার বিশ্বাস। শিশু হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে, যদি তাহাতে বাধা দাও, সে ক্রন্দন করিবে, ক্ষুদ্র পাখীটী বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এ ডাল হইতে ও ডালে যাইতেছিল, আপন মনে স্বরলহরী তুলিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করা হইল, পক্ষী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তাহার সুখ বিলুপ্ত হইল। কাহারও স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইলেই দুঃখ হয়, স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিলেই সুখ।

নিত্যতায় বিশ্বাস না থাকিলেও আনন্দ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তাহার সহিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে। মানুষের প্রাণে যদি নিয়ত মৃত্যু-চিন্তা, সংসারের বিনাশশীলতার চিন্তা,জাগ্রত থাকিত, তবে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া, ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সে

কখন সুখী হইতে পারিত না। মা তাঁহার সুকোমল শিশু সন্তানটীর জীবন সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চিন্ত যে,তিনি তাহার মৃত্যু-ভাবনা মনে স্থানও দিতে পারেন না। মনুষ্য মাত্রই মৃত্যুর অধীন, এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেন বটে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থিররূপে বিশ্বাস করেন যে, ছেলের মৃত্যু হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করিবেন। পতিপরায়ণা সাধ্বী সতী ভাবেন যে, "স্বামীকে ইহ সংসারে রাখিয়া আমি অগ্রে পরলোকে গমন করিব, স্বামীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" অপর দিকে তাঁহার প্রেমিক স্বামীও ভাবিতেছেন, "আমারই অগ্রে মৃত্যু হইবে, পত্নীবিয়োগ-শোক আমাকে ভোগ করিতে হইবে না।"

অনেক টাকা ব্যয় করিয়া কেহ এক খানা সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন, বাড়ীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস না থাকিলে তিনি কি সুখী হইতে পারেন ? যদি এরূপ বুঝিতে পারেন যে, শীঘ্রই প্রবল ঝড়ে তাহার বাড়ীখানা ভূপতিত হইবে, তবে কি তিনি চঞ্চল হইবেন না ? রাজা যদি জানিতে পারেন যে, দু দিন পরে তাঁহার রাজ্যটা পরের হস্তগত হইবে, তবে কি রাজ্যভোগে তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ? যে অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহার মত দুঃখী সংসারে কে আছে ? কেন না তাহার আশার তরু ছিন্ন হইয়াছে, জীবনের নিত্যতা-বোধ চলিয়া গিয়াছে, তাহার অবলম্বনের কিছুই নাই। কিন্তু বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিও "আরোগ্য লাভ করিব" এই আশায় বুক বাঁধিয়া ভয়ঙ্কর ব্যাধি-যন্ত্রণা ও মৃত্যু ভাবনার মধ্যেও কথঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিতেছে। নিত্যতায় বিশ্বাস

না থাকিলে, আশার উদয় হয় না, আশা না থাকিলে মানুষ জীবনে আনন্দের উৎস উৎসারিত হয় না।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং নিত্যতাবোধ—এই দুইটী উপকরণ লইয়াই আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, কোন্ স্থানে এই দুইটী ভাবের পূর্ণ পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা আছে। অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়াও যখন মানবপ্রাণ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রকৃত নিত্য বস্তু যাহা, তাঁহাতেই পূর্ণ আনন্দের সম্ভাবনা আছে। এমন যদি কোনও লোভনীয় বস্তু পাওয়া যায়, যাহার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যাহা অনন্তকাল স্থায়ী, আমাদের অনন্ত পথের চিরসঙ্গী, তবে বুঝিতে হইবে, সেখানেই প্রকৃত আনন্দের উৎস রহিয়াছে। অসার অনিত্য বস্তুতে নিত্যতার কল্পনা করিয়া তখন আর মানব প্রতারিত হয় না, প্রকৃত সার বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। স্থায়িত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, প্রকৃত আনন্দ হয় না। স্থায়িত্বের প্রতি যে পরিমাণে সন্দেহ ও আশঙ্কা হইবে, আনন্দ ও আশা সেই পরিমাণে মন্দীভূত হইবে। ভগবান ভিন্ন আর নিত্য স্থান কোথায় আছে? কেবল তাঁহারই অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব-হৃদয় নিঃসন্দেহ হইতে পারে।

জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীতে পার্থক্য কোথায়? যাহারা অজ্ঞানী তাঁহারা এই অনিত্য বিষয়কে নিত্য জ্ঞান করিয়া, ইহাকে আনন্দিত ও আশান্বিত রহিয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা প্রতিনিয়ত সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, নিত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পরব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মানব-

প্রকৃতির প্রতিকূলে কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারে না। মানব-প্রাণ আনন্দলাভের জন্ত লালায়িত হইবেই হইবে। ইহাকে সংসারে ছাড়িয়া দেও, সংসারকে কার্য্যতঃ নিত্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে সুখী হইতে চেষ্টা করিবে। অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়া, তাহাতে আনন্দ লাভ করাকেই পণ্ডিতেরা মোহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায়? সংসারের চক্ষে দেখা যায়, বালক অপেক্ষা যুবক স্বাধীন, দরিদ্র অপেক্ষা ধনী স্বাধীন, ধনী অপেক্ষা রাজা স্বাধীন ইত্যাদি। কিন্তু এই বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিয়াই কি মানব-প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়? প্রাণের ভিতরে কত নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাস, বিচ্ছেদের মর্ম্মযাতনা, দুঃখের দারুণ শেল রহিয়াছে; বৈরনির্য্যাতনের অনলে কত বীরহৃদয় নিয়ত জ্বলিতেছে। প্রাণের ভিতরে অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় এ সকল জ্বালা যন্ত্রণা থাকিতে, কোন্ প্রাণে মানুষ বলিবে, যে বাহিরের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইল? যে হৃদয় পাপের অস্ত্রাঘাতে সর্ব্বদা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, রিপুর প্রবল আক্রমণে যে হৃদয় ত্রস্ত বিকম্পিত, সে হৃদয়ের স্বাধীনতা কোথায়? বাহিরের স্বাধীনতা লাভ অতি সুলভ; কিন্তু অন্তরে স্বাধীন হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। সংসার-বাসনা, রিপুর অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া প্রমুক্ত হওয়া, অর্থাৎ আত্মার পক্ষে স্বীয় প্রকৃতিকে অবস্থিতি করাই স্বাধীনতা। যাহার হৃদয়ে স্বাধীনতা নাই, পাপশত্রুকে দমন করিবার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি রিপু বশীভূত করিতে অসমর্থ, বাসনা যাহাকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা প্রদান করে, তাহার সুখ কোথায়? আনন্দ কোথায়? তাহার

হৃদয় জলন্ত শ্মশানের ন্যায়। অতএব দেখা গেল, শুদ্ধাত্মা না হইলে, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় না। এই হৃদয়ের স্বাধীনতা লাভকেই জ্ঞানিগণ মুক্তাবস্থা বলিয়াছেন। আত্মা যত দিন পাপের অধীন, ততদিনই দুঃখ কষ্ট ভোগ করে; যখন স্বাধীন, তখন সে সুখী।

দুইটী মৌলিকতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা গেল, নিত্য বস্তুকে ধরিতে না পারিলে এবং স্বাধীন ও প্রমুক্ত হইতে না পারিলে, প্রকৃত আনন্দলাভ হয় না। ঈশ্বর নিত্য, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই প্রকৃত বস্তু ধরা হয়, এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। অক্ষয় ধামে তিনিই লইয়া যাইতে পারেন, এবং পাপের হস্ত হইতে তিনিই মুক্ত করিয়া জীবকে স্বাধীন করিতে পারেন। এই নিত্যতা এবং স্বাধীনতা প্রদান করিবার ক্ষমতা যাঁহাতে আছে, তিনিই রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

মঙ্গলস্বরূপ।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ঈশ্বর পূর্ণ এবং জ্ঞানময়ী-শক্তি বিশিষ্ট। ভবিষ্যদ্দৃষ্টি যে জ্ঞানের একটী লক্ষণ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পূর্ণতা এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টিই প্রেমস্বরূপের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যিনি পূর্ণ, তিনি সত্যসঙ্কল্প। যাঁহার সংকল্পের স্থিরতা নাই, কার্য্যের স্থিরতা নাই; অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খল ভাবের চিহ্ন যাহাতে বিদ্যমান, তিনি অপূর্ণ। এই অর্থে মানুষ অপূর্ণ। মানব-জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া অনেক সময় মানুষকে ঠেকিয়া

শিখিতে হয়, অনেক কাষ করিয়া আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়, এবং অনেক সময় একটা কাজের সহিত অন্য কাজের মিল থাকে না। কিন্তু পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরের মধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ অতি সুদৃঢ় যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পৃথিবী এক শতাব্দীতে কিম্বা সহস্র শতাব্দীতে সৃষ্ট হয় নাই। এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে কোটি কোটি বৎসর গত হইয়াছে। প্রথমে বাষ্প, তার পর জল, তৎপর জলচর, পরে স্থল, সেই সময় উভচর প্রাণীর সৃষ্টি, এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই সৃষ্টি-তত্ত্ব যদি আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই, ঈশ্বর কেমন পরিণামদর্শী। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন হইয়াছে। এই সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা ও পরিণামদর্শিতা দেখিতে পাই। এই শৃঙ্খলা ও পরিণামদর্শিতাতেই শুভ উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। যিনি কোটি কোটি বৎসর হইতে পরমাণুর পর পরমাণু, মৃত্তিকার পর মৃত্তিকা, জল অনল সৃষ্টি করিয়া এমন সুন্দর অত্যাশ্চর্য্য পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা কি শুভ ইচ্ছা নহে?

যদি কেহ বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম করিয়া বহু বৎসরে একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করেন, তবে আমরা বুঝিব যে, সেই বাটী ব্যবহার করাই নির্ম্মাণকর্ত্তার উদ্দেশ্য। সেই বহু ব্যয় ও যত্নে নির্ম্মিত বাড়ীখানা কখনও অগ্নিতে দগ্ধকরা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। সেইরূপ যিনি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্যে, জলে স্থলে অতি অপূর্ব্ব যোগ স্থাপন

করিয়াছেন এবং অনন্ত সৃষ্টি পরম্পরাকে অতি সুনিয়মিতরূপে পরিচালন করিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি মঙ্গলজনক নহে? অবশ্য এ কথা সত্য যে, এমন দিন আসিবে, যখন এই সূর্য্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, এই পৃথিবী বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু তিনি যে সকল অমর মানবাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা এই সৌরজগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানে প্রেমে উন্নত হইতেছেন, এই পৃথিবী যাঁহাদের মাতৃভূমি, তাঁহারা ত নিত্য কাল থাকিবে। যিনি মানবাত্মাকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কে বলিবে তিনি প্রেমময় নহেন?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমরা বাহ্যশক্তি ও অন্তর্নিহিত শক্তিতে তাঁহার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাকি এবং সেই শক্তির মধ্যে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এই যে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা-সমন্বিত পরমাত্মবস্তু, হয় ইহাকে শুভসংকল্প বলিতে হইবে, নতুবা অশুভ সংকল্প বলিতে হইবে। অশুভ সংকল্প বলিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই। কেন নাই?

আমাদের মধ্যে যে অপূর্ণ জ্ঞান, অপূর্ণ প্রেম আছে, তাহার সার্থকতার জন্য, পূর্ণতার জন্য তিনি উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। মানবাত্মার প্রকৃতি এই যে, সে যতই জ্ঞান লাভ করিবে, ততই জ্ঞানের অভিমুখে তাহার গতি হইবে; যতই প্রেম লাভ করিবে, ততই প্রেমের অভিমুখে গতি হইবে। তাহার সম্মুখে অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের আধার রহিয়াছে বলিয়াই মানবাত্মার এরূপ অনন্তমুখিনী গতি। মানবাত্মা যে অনন্ত উন্নতিশীল, এখানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জ্ঞান ও প্রেমের কখনও কোনও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তৃপ্তি

লাভ করিতে পারি না। এই উন্নতিশীল মানবাত্মাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি শুভসংকল্প, মঙ্গলস্বরূপ নহেন? তুমি যখনই বলিবে, মানবাত্মা অমর ও উন্নতিশীল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, পরমেশ্বর শুভসংকল্প ও মঙ্গলময়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার অচ্ছেদ্য যোগ এবং সেই মহান্ পরমেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই আমরা জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য লাভ করিয়া থাকি। যিনি এইরূপে মানবাত্মাকে সম্পত্তিশালী করিয়াছেন, না চাহিতে সকল দিয়াছেন, জীবকে দেবত্বের অধিকারী করিয়াছেন, তিনি কি মঙ্গলময় নহেন?

আমাদের মধ্যে যে প্রেম আছে, তাহা অপূর্ণ, এ কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং একথাও বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ প্রেম আছে বলিয়াই অপূর্ণ প্রেমের ধারণা হয়। আমি সৃষ্ট জীব, আমার মধ্যে এক বিন্দু প্রেম আছে, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কি প্রেমময় নহেন? একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক জন বালকের পিতা মাতা পরলোকে গমন করিলেন। তাহার বড় ভাইটী এরূপ রোগাক্রান্ত হইল যে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। এই সময় উক্ত বালক রোগাক্রান্ত ভ্রাতার নিকটে এই বলিয়া চিঠি লিখিল, "দাদা, এত দিন জানিতাম, ঈশ্বর মঙ্গলময়; কিন্তু এক্ষণ সেই ভ্রম দূর হইল। তিনি যদি মঙ্গলময় হইতেন, তবে আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিবে কেন?"

লেখক এক দিন সেই মুমূর্ষু যুবককে দেখিতে গিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত ঐ পত্র খানি দেখিতে পাইলেন। [illegible]

ঐ যোগীর পার্শ্বে সেই বালক বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছিল। তাহার আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে রাত্রি দিন প্রাণপণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিতেছে। লেখক তাহাকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তোমার দাদাকে এই চিঠি খানা লিখিয়াছ? বালক উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই লিখিয়াছি।"

লেখক। "ঈশ্বর যে প্রেমময় তুমি তাহা বিশ্বাস কর না?"

বালক। "না।"

লেখক। "আচ্ছা, তোমার দাদাকে তুমি খুব ভালবাস?"

বালক। "হাঁ, যারপরনাই ভালবাসি।"

লেখক। "তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি দিন রাত দাদার পাশে বসিয়া রহিয়াছ, কত যত্নে সেবা করিতেছ, ইহা তেই বেশ বুঝা যাইতেছে, তুমি দাদাকে খুব ভালবাস। এক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার দাদাকে এত ভালবাস, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তোমাদিগকে ভালবাসেন না? তাঁহার মধ্যে কি প্রেম নাই? যাঁহার মধ্যে যাহা নাই, তিনি কি তাহা অন্যকে দিতে পারেন; পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ না হইলে, তোমাকে প্রেমিক, ভ্রাতৃভক্ত করিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিলেন?" বালক নীরব হইল।

হে মানব! অবিশ্বাস দূর কর। ভাব, তোমার মধ্যে যখন এক বিন্দু প্রেম আছে, তখন যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি প্রেমসিন্ধু।

একটী ভাই ও ভগিনীর কথা বলিতেছি। এই ঘটনা ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল। ভাইটী গ্রীষ্টান, ভগিনী ব্রাহ্মিকা। সর্ব্বদাই ভাই

ভগিনীকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন যে, "ভগিনি ! তুমি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ কর । বাইবেল ও যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী হও, নতুবা অনন্ত কাল নরক ভোগ করিবে। ভগিনী নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত সমর্থন করেন এবং খ্রীষ্টানধর্ম্মের অনন্ত নরক ভোগের মত খণ্ডন করেন । এইরূপে কিছু কাল গত হইল । ভগিনীকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য ক্রমশঃ ভ্রাতার যত্ন ও চেষ্টা বাড়িতে লাগিল । ভগিনী অনন্তকাল নরক ভোগ করিবেন,ইহা ভাবিয়া খ্রীষ্টান ভ্রাতা অস্থির হইলেন । এক দিন রজনীতে ভ্রাতা, ভগিনীকে বিশেষ-রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন । অনন্তকাল নরক ভোগ কি ভয়-ঙ্কর যাতনা, তাহা জলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মিকা ভগিনী পূর্ব্ববৎ স্থির ও গম্ভীরভাবে অকাট্য যুক্তিদ্বারা অনন্ত নরকের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল । তখন ভ্রাতা, অতি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া শয্যায় গমন করিলেন । সারা রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না । তিনি ভগিনীর ভাবী দুর্দ্দশা ভাবিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । চক্ষের জলে তাঁহার উপাধান সিক্ত হইয়া গেল । যখন রাত্রি প্রভাত হইল,তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, "আমার ভগিনী অনন্ত নরকে বাস করিবেন, ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, কেন না আমি আমার ভগিনীকে ভালবাসি । যিনি আমা-দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সন্তানকে অনন্ত কাল নরকে রাখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? তিনি আমাকে এক বিন্দু প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন, তাহাতেই ভগিনীর জন্য এত চিন্তা—এত ব্যাকুলতা—এত ক্রন্দন ! তিনি আমাদের

সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া কি আমাদিগকে অনন্ত নরকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তিনি কি আমার অপেক্ষা নির্দ্দয়? তাহা কখনও নহে। তিনি নির্দ্দয় হইলে, হৃদয়বান্ মানুষকে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। দূর হউক আমার ভাবনা, পরমেশ্বর প্রেমময়, তিনি কখনও অনন্ত নরক সৃষ্টি করিয়া মানুষকে অনন্ত বিনাশের পথে রাখিতে পারেন না।" সেই খ্রীষ্টান যুবক সেই দিন শুভমুহূর্ত্ত হইতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার অনন্ত নরককল্পনা দূরীভূত হইল, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ভগিনীরই জয় হইল। বাস্তবিক মানবহৃদয়ের পবিত্র প্রেমবিন্দু, সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধুর বিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে কি করিয়া মঙ্গলময় বলিব? তিনি যে সকলকে স্নেহ করেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? সংসারে দেখিতেছি, কেহ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত সেবনে রসনা তৃপ্ত করে, কেহ শাকান্নেও জঠর জ্বালা নিবারণ করিতে পারে না। কেহ স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিয়া, রাজ-সুখভোগ করে, কেহ বৃক্ষতলে—ধুলিধূসরিত অঙ্গে রাত্রিযাপন করে। স্বজন-বিরহে কত ব্যথিতহৃদয় আর্ত্তনাদ করিতেছে; দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, শোক, দারিদ্র্য ইত্যাদি দুঃখের বোঝা এত ভারি যে, মানুষ তাহা বহন করিতে অসমর্থ। এজন্য কত লোক আত্মহত্যা করিতেছে, কত লোক নানাবিধ পাপ করিতেছে, কত ভয়ঙ্কর কার্য্য পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনি যদি মঙ্গলময় হইতেন, তবে এ সকল দুঃখ যন্ত্রণা, পাপ তাপ জগৎ হইতে একেবারে দূর করিয়া দিতেন। এ সকল যখন আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তখন কি করিয়া বলিব তিনি মঙ্গলময়?

সংসারে দুঃখ আছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু যেমন দুঃখ আছে, আবার তাহা নিবারণের উপায়ও আছে। সেই দুঃখ নিবারণের উপায় কি ? ব্রহ্মজ্ঞান লাভই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। বিষয়টী একটু আলোচনা করা যাউক।

দুঃখ কি ? দুঃখ ভাবাত্মক নহে—কোনও বস্তু নহে ; যেমন আলোকই বস্তু, অন্ধকার বস্তু নহে, আলোক যেখানে যাইতে পারে না, সেখানেই অন্ধকার, তেমনি আনন্দ লাভই মানবের প্রকৃতি, দুঃখ আনন্দের অভাব মাত্র। এই দুঃখ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়, মন ও চিন্তাসাপেক্ষ। যার যেমন শিক্ষা, যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, সুখ দুঃখাদি ও তার তেমন।

বালকদিগের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই, এক টুকরা লাল কাপড়—যাহার মূল্য চারিটী পয়সার বেশী নহে, তাহা পাইয়াই বালক অতি সুখী। যে বালকের ঐ কাপড় টুকু নাই, সে মনে করে, 'আমি বড় দুঃখী, ঐ ছেলেটীর লাল কাপড় আছে, ও কেমন সুখী !' ক্রমে বালক যখন জ্ঞান লাভ করে, তখন তাহার সুখ দুঃখ আর ঐ লাল কাপড়ের উপর নির্ভর করে না। তখন সে ভাবে, যে ব্যক্তি শাল গায় দেয়, ঘড়ি চেন ব্যবহার করে, বিলাতি জুতা পরে, ভাল আহার করে, ভাল গৃহে শয়ন করে, সে বড় সুখী। আমি যদি ঐ বাবুটীর মত হইতাম, তবে কত সুখে থাকিতাম।' যখন সে ব্যক্তি জ্ঞানরাজ্যে একটুক অগ্রসর হয়, তখন ভাবে 'আমি যদি ধনী হইতাম, লেখক হইতাম, বিচারক হইতাম, তবে বড়ই সুখ হইত।' তৎপর যখন সে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করে,

তখন আর তাহার এই রূপ দুরাশাজনিত দুঃখ থাকে না। তখন সে বলে, "প্রভো, আমি কাহারও মত হইতে চাহি না, আমি ধনী হইতে চাহি না, কবি হইতে চাহি না, দেশবিখ্যাত লোক হইতে চাহি না, তুমি আমাকে যেমন করিয়াছ, তাহাতেই আমার সুখ। আর কিছুই চাহি না, কেবল এই প্রার্থনা, আমি যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি। তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার আনন্দ।"

আমরা সচরাচর চতুর্দ্দিকে যে দুঃখের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস ও অপ্রেমমূলক। এমন লোক সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, যাহারা লৌহসিন্দুক ধনে পূর্ণ হইলেও সুখী হয় না, সুন্দর বাড়ী ঘর করিয়াও সুখী হয় না, মান সম্ভ্রম লাভ করিলেও সুখী হয় না। জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে তাহাদের হৃদয় হইতে নিয়তই এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, "হায় হায় সুখী হইলাম না, সুখ পাইলাম না, বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা!" এই মর্ম্মভেদী চীৎকারের প্রত্যেক বাক্যেই ধর্ম্ম-জ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তুমি ধনী, ধনতৃষ্ণায় তোমার রাত্রে সুনিদ্রা হয় না; ঐ দেখ কুটীরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন, তিনি কেমন সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তুমি মানী, কিরূপে অধিকতর সম্মান লাভ করিবে, সে জন্য তোমার চিত্ত নিয়ত চঞ্চল; কিন্তু ঐ দেখ, নগণ্য ব্যক্তি কেমন সুখে দিন যাপন করিতেছে। তুমি শোকাতুর, দিবা রাত্রি ক্রন্দন করিয়া অতিবাহিত করিতেছ; ঐ দেখ, শোকের অস্ত্রাঘাতকে উপেক্ষা করিয়া ধীর পুরুষের ন্যায় ভক্ত ব্যক্তি কেমন শান্তভাবে কাল যাপন করিতেছেন। তুমি দুর্ভিক্ষের

ভীষণ প্রকোপে পড়িয়া অস্থির হইয়াছে, ঐ শুন, সাধুব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় বলিতেছেন, "হে প্রেমময়, ইহা তোমারই প্রেমের লীলা, তুমি এই অনাহার-জনিত কষ্ট প্রদান করিয়া, আমাকে দীনতা শিক্ষা দিতেছ। প্রভো, তোমারই জয় হউক।"

পদ্মা-তীরের মৃত্তিকা অতি কোমল, এই জন্যই তরঙ্গাঘাতে অতি সহজে সেই মৃত্তিকা ভগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু যেখানে পাহাড় আছে, প্রবল তরঙ্গাঘাতে সে স্থান ভগ্ন হয় না। সেই রূপ যে হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, সেখানে শোক-দুঃখ স্থান প্রাপ্ত হয় না। দুঃখ সাময়িক অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। এই জন্যই এক সময়ে যাহাতে দুঃখের মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়, অন্য সময়ে তাহাতেই সুখের উৎস উৎসারিত হইয়া থাকে। মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত সুখ দুঃখেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই দুঃখ বিনাশের উপায় আছে। যাঁহার চিত্ত সবল, তাঁহারই দুঃখ বোধ কম, যাহার চিত্ত দুর্ব্বল তাহার দুঃখ বেশী। এই কারণেই বিষয়ী অপেক্ষা জ্ঞানীর দুঃখ-বোধ অল্প এবং জ্ঞানী অপেক্ষা ঈশ্বর-বিশ্বাসীর দুঃখ-বোধ আরও কম।

আর একটী কথা, মনুষ্য যতই দুঃখভোগ করুক, সঙ্গে সঙ্গে সুখভোগ করিবেই করিবে। সকলের জীবনেই দুঃখ অতি কম। ভীষণতা বশতই দুঃখের এত নিন্দা। যে সকল ঘটনায়—যে সকল অভাবে, দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা নিয়তই আমাদের নিকটে উপস্থিত থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানবান যিনি, তিনি তাহাতে বিচলিত হন না।

আর এক দিক দিয়া দেখিলে, এই দুঃখের প্রয়োজনীয়তাও আমরা অনুভব করিতে পারি। সংসারে অমৃত আছে, বিষও আছে। বিষ সুস্থ শরীরের পক্ষে নহে; কিন্তু কেহ জ্বররোগে বিকারগ্রস্ত হইলে হলাহলের প্রয়োজন হয়। তেমনি দুঃখেরও প্রয়োজন আছে। সংসারে দুঃখ কষ্ট না থাকিলে অভাব পুরণের জন্য লোকের আগ্রহ হইত না। অভাব পূর্ণ করিতে গিয়া লোকে দয়ালু হয়, কঠোর হৃদয় প্রেমে কোমল হয়। এক দিকে সহস্র সহস্র লোক দুর্ভিক্ষে কাতর, অপর দিকে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহাদের অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র! কেমন সুন্দর দৃশ্য! এক দিকে শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ, অপর দিকে প্রিয়জনের সান্ত্বনা-দান; একদিকে সংসারের দারুণ অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ, অপর দিকে সেই অভাব পূরণের জন্য আত্যন্তিকী ব্যস্ততা, পরিশ্রম, জ্ঞানালোচনা ইত্যাদি।

দুঃখ কি মিষ্ট ও মধুর নহে? দুঃখ কি সকল সময়েই ভীষণ? দুঃখ কি প্রেমের মলয়ানিল আনয়ন করে না? বিচ্ছেদ না থাকিলে মিলনের মাধুর্য্য কে অনুভব করিতে পারিত? শোক আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য আনয়ন করে। দুঃখ আসিয়া আমাদের অহঙ্কৃত মনকে বিনত করে। অপর দিকে দারিদ্র্য, আমাদের বৈষয়িক উন্নতির পথ খুলিয়া দেয়। অভাব না থাকিলে সংসার কি বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইত? রাজনৈতিক, সামাজিক জগতে সুমহৎ কল্যাণকরবিধি সমূহ প্রবর্ত্তিত হইত? বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য এবং শিল্প বাণিজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি হইত? মানব মণ্ডলীর কার্য্যকারিণী শক্তি এত বর্দ্ধিত হইত? মানবজাতির ইতিহাস এমন সুখ-

পাঠ্য হইত? অতএব দুঃখ ত ভয়ের বস্তু নহে। দুঃখ মঙ্গলই আনয়ন করে। যাহাকে সাধারণ লোকে অমঙ্গলের কৃষ্ণচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাহারই মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এক জন সাধু বলিয়াছেন, "যখনই আমি বিপদে পতিত হই, যখনই চারিদিক দিয়া বিপদ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলে, তখনই আমি সবল হই।" বাস্তবিক অভাব—দুঃখ—কষ্টই আমাদের চরিত্রকে গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তুত করে। যাহার জীবনে কখনও দুঃখ ভোগ হয় নাই, বলিতে কি যাহার ভাগ্যে দুঃখ ঘটে নাই, তাহার চরিত্র বড়ই অসম্পূর্ণ। দুরন্ত বালক যেমন বেত্রাঘাতে বাধ্য ও বিনীত হয়, তেমন প্রবৃত্তিকুলদ্বারা চঞ্চল মন দুঃখের কষাঘাত পাইয়া সরল পথে গমন করে। সুতরাং দুঃখকে কি আমরা উপকারী বন্ধু বলিয়া অভিবাদন করিব না? তবে দুঃখের সময় বিধাতাকে কেন নিন্দা করিব?

কেহ কেহ বলেন, "যে ব্যক্তি জন্মান্ধ হইয়া সৃষ্ট হইল, এই সুন্দর জগৎ দর্শন করিতে পারিল না; অথবা যে ব্যক্তি বধির কিম্বা পঙ্গু, তাহাদের সম্বন্ধে কি বিধাতা বিরূপ নহেন? যে শক্তি বিহীন হইয়া তাহারা জগতে আসিয়াছে, সেই শক্তি আর কখনও লাভ করিতে পারিবে না; তবে তাহারা কি উপায়ে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

তাহারা যাহা চাহে, তাহা পাইবেনা বটে; কিন্তু তাহাদেরও দুঃখ নিবারণের উপায় আছে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। যাহার মন ধনের জন্য লালায়িত—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অর্থের অভাব অনুভব করে, তাঁহাকে কোটি কোটি টাকা

দিলেও সে তৃপ্ত হইবে না। সম্মানের জন্য যাহার চিত্ত অস্থির; বহু সম্মান লাভ করিলেও সে ব্যক্তি প্রকৃত শান্তি পাইবে না। সেইরূপ অন্ধ ব্যক্তি দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত সুখী হইতে পারিবেনা। এরূপ হইলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই সুখী হইত। কিন্তু বিনিই হউন, ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নি প্রাণে প্রজ্জ্বলিত না হইলে, কেহই ভূমানন্দ লাভ করিতে পারে না। অন্ধ, আতুর, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই ব্রহ্মলাভের অধিকার আছে; সুতরাং দুঃখ বিনাশের সকলেরই শক্তি আছে। বিধাতার এমন সুব্যবস্থা যে, যিনি চেষ্টা করিবেন, তিনিই ব্রহ্মসেবক হইয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

মানুষ যখনই সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করেন, তখনই পার্থিব সুখ দুঃখ দূরীভূত হয়; অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই তাহার মন বিচলিত হয় না। অবাতকম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় তিনি স্থির থাকেন।

এখন পূর্ব্ব লিখিত কথার আলোচনা করা যাউক। মানব-বুদ্ধি অপূর্ণ, আমরা জগতের অনেক তত্ত্বই বুঝিতে অক্ষম। কেন লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, কেন লক্ষ লক্ষ লোক ভূকম্পন ও জলপ্লাবনে মানবলীলা সংবরণ করিতেছে, কেন মাতার ক্রোড় হইতে সুন্দর শিশুটী বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, কেন রোগ শোকে চারিদিকে হাহাকার উঠিতেছে,—এ সকল প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদান করা মানববুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। এ সকল ভয়ানক ঘটনার মধ্যে কি মঙ্গলভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা মানব-বুদ্ধি বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু একটী সার কথা

এই যে, পরমেশ্বরকে আত্মার মূলে যখন মঙ্গলময়রূপে দেখা যায়, তখন বাহিরের ঘটনাবলীর সম্যক উত্তর প্রদান না করিতে পারিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল স্থলে কি কি মঙ্গল ঘটিতেছে, ঐ ঐ স্থলে বিধাতার কি শুভ অভিপ্রায় রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বটে; কিন্তু তাঁহাকে যখন হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলময় বলিয়া জানিতেছি, তখন বাহিরের ঐ সকল ঘটনাও মঙ্গলজনক।

জনৈক পথিক দেখিতে পাইলেন, একটী বালককে একজন স্ত্রীলোক ভয়ানক প্রহার করিতেছে। প্রথমে দেখিয়া ভাবিলেন, এ স্ত্রীলোকটা কি নির্দ্দয়! পথের বালককে ধরিয়া প্রহার করিতেছে! তৎপরে তিনি শুনিতে পাইলেন, প্রহারকারিনী আর কেহই নহে, বালকের মাতা। তখন ভাবিলেন, মা যখন মারিতেছেন, তখন ভালরই জন্য। পরে শুনিলেন, বালক চুরি করিয়াছিল, এজন্য মাতা তাহাকে প্রহার করিয়া শাসন করিতেছেন। তখন পথিক ভাবিলেন, বেশ হয়েছে, এরূপ শাসন না করিলে ছেলে ভাল হইবে কেন? জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা উক্ত পথিকের ন্যায় শেষ সিদ্ধান্তে অনেক স্থলেই উপনীত হইতে পারি না; কিন্তু পথিক যেমন বলিলেন, মা যখন মারিতেছেন, তখন ভালরই জন্য। আমরাও তেমন বলিতে পারি, যখন প্রেমময় পরমেশ্বরের রাজ্যে দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তখন তাহা মঙ্গলেরই জন্য।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একই মূল শক্তির অনুপ্রকাশ।

সকলের মূলে এক পরাশক্তি বিদ্যমান। যে শক্তি বায়ুতে, সেই শক্তি অনলে, সেই শক্তিই বজ্রের ভীষণ নির্ঘোষে; যে শক্তি পুষ্প-রেণুতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তিই প্রচণ্ড তেজোময় সূর্য্যকে কক্ষ পথে ভ্রমণ করাইতেছে; যে শক্তি প্রতিদিন আমাদের অন্নগ্রাস মুখে তুলিয়া দিতেছে, সেই শক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ চক্ষে, সাধারণ বুদ্ধিতে, চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বলিয়া অনুমিত হয় বটে; কিন্তু শক্তি-তত্ত্ব আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করিলে নিঃসন্দেহরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সকলের মূলে এক মহতী জ্ঞানময়ী শক্তি বিরাজিত।

জ্ঞান স্বরূপের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এই শক্তি আর কিছুই নহে, জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা সমন্বিত আত্মবস্তু। সুতরাং এক অনন্ত চিদ্‌বস্তুরই রাজত্ব সর্ব্বত্র এবং সকল অবস্থায়। তিনি শক্তিরূপে জ্ঞানরূপে বিরাজিত। তাঁহার কর্তৃত্ব, তাঁহার লীলা এবং তাঁহার রাজত্ব ভিন্ন অন্যের হস্ত নাই।

জগতে অতি সুন্দর শৃঙ্খলা দেখা যায়। একের সহিত অন্যের কেমন সুন্দর যোগ, একে অন্যের প্রতি কেমন নির্ভর করিতেছে। কি জড় কি প্রাণিজগৎ উভয় দিকেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট যোগ না থাকিলে গ্রহ উপগ্রহ রক্ষিত ও নিয়মিত হইত না। সূর্য্য কত বড় পদার্থ, তাহার সহিত সামান্য দুর্ব্বাদলের কেমন যোগ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক মহা যোগ স্থাপিত রহিয়াছে। সকলই এক সূত্রে গাঁথা। সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত থাকে, তেমন এক জ্ঞান সূত্রে এই জগৎ সংবদ্ধ রহিয়াছে। সংযোগেই জগ-

তের অস্তিত্ব। যেমন জড়-জগতে সংযোগ, তেমন প্রাণিজগতে সংযোগ। মানুষের মধ্যে এই সংযোগ বিশেষ রূপে প্রস্ফুটিত। মানবপ্রাণের মধ্যে প্রেমের অচ্ছেদ্য যোগ। অপর দিকে প্রাণিজগতের সহিত জড় জগতের যোগ। এই সংযোগ দর্শন করিলে অনন্ত জগৎ এক জনের হস্ত নির্ম্মিত বলিয়াই উপলব্ধি হয়। সংযোগ একত্ব প্রকাশক।

জ্ঞান বলিলেই একত্ব বুঝায়। কেননা নিরাকার চৈতন্য পদার্থের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ কোথায় হইতে পারে? দেশ কালে যাহা বদ্ধ, তাহারই সীমা আছে। ঈশ্বর চৈতন্যময় এবং দেশ কালের অতীত, সুতরাং তিনি বহু হইতে পারেন না, খণ্ডও হইতে পারেন না।

তিনি পূর্ণ। পূর্ণ বলিলেই সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝায়। যিনি পূর্ণ তাঁহার অতিরিক্ত, তাঁহার বাহিরে আর কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি পূর্ণ—সকল তাঁহাতেই বিধৃত, এক বিন্দুও যদি পরিত্যক্ত হয়, তবেই তাঁহার পূর্ণতার খর্ব্ব হইবে। পূর্ণ অর্থই একমেবাদ্বিতীয়ং।

যখন স্বীয় আত্মার মূলে প্রবেশ করি, তখন দেখিতে পাই, আত্মা একেরই সহিত যুক্ত। নদী যেমন নিরন্তর সাগরের দিকে গমন করে, তেমন মানবাত্মা অনন্ত—অখণ্ডের দিকে গমন করিতেছে। কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্ব্বদা উত্তর দক্ষিণ দিকে লম্বমান থাকে, তেমন জীবাত্মা সর্ব্বদা সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মুখীন হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, আপনাকে কেহই এক ছাড়া দুই বলিয়া জানিতে পারে না। আমরা আপন আত্মার আদর্শ অনুসারে

জগতের আত্মার একত্বের প্রমাণ পাই ; আর, তাহারই আদর্শ অনুসারে আমরা পরমাত্মায় অসীম একত্ব অবগত হই।

পবিত্রস্বরূপ।

আমরা আত্মার মূলে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে পবিত্ররূপে দেখিতে পাই। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ভাল মন্দ, পাপ ও পুণ্য এই দুইটী পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। এই কর্ত্তব্যের পথে পুণ্যের পথে চলাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদা বাস করিয়া বিবেকরূপে—প্রজ্ঞারূপে—বুদ্ধিরূপে আমাদিগকে পুণ্যপথে পরিচালিত করিতেছেন। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, তাহা মানব অন্তরে তিনিই প্রকাশ করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে চলিতে পারিলেই মানব ধর্ম্মরাজ্যে উপস্থিত হয়।

আমাদের মধ্যে যে নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শ প্রস্ফুটিত হয়, তাহা কে প্রেরণ করেন? আমরা ত সে সকল আদর্শকে সৃষ্টি করি না। পুণ্যস্বরূপ পরমেশ্বরই ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সত্য কথা বলা উচিত, পরদ্রব্য হরণ করা উচিত নহে ; দস্যুতা, নরহত্যা পাপ ; ঈর্ষা পাপ, প্রেমই ধর্ম্ম ইত্যাদি উপদেশ মানুষ কোথা হইতে লাভ করিতেছে? পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরই হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া এ সকল উপদেশ দিতেছেন। এই উপদেশ লাভ করিয়াই মানুষ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিতেছে। কিন্তু ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, যেমন নদীর উৎপত্তি স্থানে, ঝরণার জল অতি নির্ম্মল থাকে, যতই সেই জল নদীর

আকারে নানা দেশের মধ্য দিয়া গমন করে, ততই আবর্জনার স্পর্শে পঙ্কিল হয়, তেমন মানুষ বিবেকের মধ্য দিয়া যাহা অনুভব করে, অনেক সময় বুদ্ধি ও স্বার্থপরতাতে তাহা মলিন হইয়া যায়। এই জন্যই প্রচলিত শাস্ত্র সমূহের মধ্যে ভাল কথার সঙ্গে সঙ্গে মন্দ কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা তিনি যে উপদেশ দেন,তাহা অতি নির্ম্মল ও পবিত্র।

মানব হৃদয়ে সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যে ও অকর্ত্তব্যে, সুনীতি ও দুর্নীতিতে, পাপ এবং পুণ্যে যুদ্ধ হইতেছে। এই দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে কে? দেবত্বেরই জয় হইতেছে, পবিত্রতারই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পরমেশ্বর পবিত্রস্বরূপ, এই জন্যই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের বিনাশ হইতেছে।

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই, লোকে ধর্ম্ম ও নীতিকে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যাকুল। লোকে ধর্ম্মের জন্য— সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে—ধর্ম্ম ও সত্যের সর্ব্বাপেক্ষা আদর করে, যিনি ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ তাঁহাকে পূজা করে। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সভ্য অসভ্য সকল লোক— সকল জাতির মধ্যেই পবিত্রতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। ভাল হইবার জন্যই সকলের আকাঙ্ক্ষা, মন্দ হইতে কেহ চাহে না। পবিত্রতা লাভ ভিন্ন ভাল হইবার আর উপায় নাই। পতঙ্গ যেমন অগ্নি দেখিলেই তাহাতে ঝম্প প্রদান করে এবং পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, তেমন মানুষও নিয়ত পুণ্যাগ্নিতে পুড়িতেছে। এইরূপে মানবের পাপজীবন ধ্বংস হইতেছে, এবং নবজীবন

লাভ হইতেছে। ইহাই সংসারের নিয়ম। যিনি এই নিয়ম করিয়াছেন, তিনিই পরম পবিত্রস্বরূপ।

পাপ দুঃখ, পাপ অতৃপ্তি। এই পাপ লইয়া মানুষ কি বাঁচিতে পারে? নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মানব-প্রাণ সর্ব্বদা উদ্‌বিগ্ন। মানবাত্মার প্রকৃতি এই যে, পাপের দুর্গন্ধ সহিতে পারে না। পাপে পতিত হইলেই তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। পাখী যেমন মুক্ত আকাশে অতি আরামে থাকে, তেমন মানবাত্মা পুণ্যের আলোকে থাকিলেই পরম সুখী হয়।

মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ প্রভৃতি যে সকল গুণ রহিয়াছে, পবিত্রতা ভিন্ন তাহা কখনও স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বর যেমন অনন্ত জ্ঞানময়, পূর্ণ প্রেম-ময়, আনন্দময়, তেমন পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ। অপবিত্রতাই পাপ, যিনি পূর্ণ তাঁহাতে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না।

এই পবিত্রতাই সৌন্দর্য্য। পাপ কুৎসিৎ, পুণ্যই সৌন্দর্য্য। পুণ্যের জলে সমুদয় পাপ মলিনতা ধৌত হইলেই মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। শিশুর মুখ নিষ্কলঙ্ক, এজন্যই এত সুন্দর; সতীর মুখ পবিত্র এজন্যই সতী নারী পরমাসুন্দরী; সাধুর মুখে তাঁহার হৃদয়স্থ পবিত্রতা ফুটিয়া বাহির হয়, এজন্যই সাধুর মূর্ত্তি পরম রমণীয়। পরমেশ্বর পূর্ণ পবিত্র, সুতরাং তিনি চিরসুন্দর।

ধ্যান ও প্রার্থনা।

পরমেশ্বরের প্রত্যেক স্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্তুতি করিবার নামই আরাধনা। যখন সাধক, আরাধনা করিতে করিতে প্রগাঢ় অবস্থা লাভ করেন, তখনই ধ্যানের সময়। ধ্যানের সময় পৃথকভাবে স্বরূপ চিন্তা থাকে না, কেবল এক সত্তা মাত্র সাধকের অবলম্বনীয় হয়। অথচ সেই সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের সমুদয় স্বরূপই আছে। পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার নিগূঢ় যোগের নামই ধ্যান। "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনও বাধা নাই ভুবনে।" ইহাই ধ্যানের উৎকৃষ্ট অবস্থা। পরব্রহ্মে বাস করিতেছি, কার্য্য করিতেছি; তিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি মূলাধার, তিনি একমাত্র অবলম্বনযষ্ঠি, এইরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্যই ধ্যানের প্রয়োজন। ধ্যানেতেই বিশেষভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার যে পরমযোগ রহিয়াছে, ধ্যানের সময়ই সেই সম্বন্ধ উজ্জ্বল রূপে উপলব্ধি হয়।

ধ্যানের পরে প্রার্থনা অতি স্বাভাবিক। ধ্যানের সময় সাধক দেখিতে পান যে, "তিনি কত সুন্দর, আমি কত কুৎসিত, তিনি পবিত্র আমি পাপে জর্জ্জরিত; তিনি প্রেমময়, অপ্রেমের হলাহলে আমার হৃদয় বিষাক্ত। পরম চৈতন্য পরব্রহ্মের সহবাসে জীবনের এইরূপ ক্ষুদ্রতা ও হীনতা অনুভব করিয়া, মানবাত্মা স্বতঃই বলিয়া উঠে;—"হে জগদীশ, আমাকে অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে সত্যস্বরূপ,

আমার নিকট প্রকাশিত হও; দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

ধ্যান ভিন্ন প্রকৃত প্রার্থনা হয় না। যাঁহাকে জানি না, যাঁহাকে দেখি নাই, যিনি আছেন কিনা বলিতে পারি না, তাঁহার নিকটে কি চাহিব? ধ্যানেই মানবাত্মাকে ঈশ্বরমুখীন করে এবং মানব যে কত অধম তাহা বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং তখনই ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনি সাধকের হৃদয় হইতে উত্থিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজের এই উপাসনা-প্রণালী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং মানবাত্মার উন্নতির পক্ষে অতি অনুকূল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য এই যে, সে জ্ঞানে, প্রেমে এবং পুণ্যে উন্নতি লাভ করিয়া, ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে। এই লক্ষ্য সাধনের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী বিশেষ উপযোগী। নিয়ত উচ্চ আদর্শ চিন্তা করিলে মনও উচ্চ ভাবাপন্ন হয়। ঈশ্বরের ন্যায় মহান্ এবং উচ্চতর আর কে আছেন? সুতরাং তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিলে মন নিশ্চয়ই উন্নত হইবে।

উপাসনার মধ্যে একটী লক্ষ্য আছে। উদ্বোধন, আরাধনা এবং ধ্যান ও প্রার্থনা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়। এই প্রণালীতে একটী স্বাভাবিক শৃঙ্খলা আছে, এই শৃঙ্খলা ভগ্ন করা কর্ত্তব্য নহে। উদ্বোধনের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা আরাধনার উদ্দেশ্য নহে এবং আরাধনার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা ধ্যানের উদ্দেশ্য নহে। এক একটীতে এক একটী ভাব প্রস্ফুটিত হয়। ইহার কোনও একটী বাদ দিলে ইহার স্বাভাবিকত্ব থাকে না।

উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া। তাঁহাকে লাভ

করিতে হইলে, বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। সামান্য পার্থিব জ্ঞান আমরা বিনা সাধনায় লাভ করিতে পারি না, পরাৎপর পরমেশ্বরকে কিরূপে সহজে লাভ করিব? অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, মহা সাধনার প্রয়োজন। সাধন ভিন্ন কেহ ধর্ম্ম-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, এক দিকে যেমন এই নির্দ্দিষ্ট প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে, অপর দিকে ব্যাকুলতা, সংযম, নিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইবে। এবং শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ গ্রহণ, মহাজন-বাক্য পাঠ ও তত্ত্ব-বিদ্যা আলোচনা করিতে হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি সাধনাতেই হয়।

সমালোচনা।

পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রথমে সামাজিক উপাসনায় আরাধনা ব্যাখ্যাকালে, সংস্কৃত আরাধনা মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ অনুযায়ী সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, মঙ্গল, অদ্বিতীয় এবং পবিত্রস্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপর তিনি সর্ব্বশেষে পবিত্রস্বরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া আনন্দস্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মানন্দ যাহা করিতেন, তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মভক্তগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, সুতরাং সকলেই সর্ব্বশেষে আনন্দস্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই বিধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি শুধু গ্রহণ করিলেন না, তাহা নহে, তিনি এক নূতন পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি অদ্বৈতস্বরূপ সকলের শেষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এখনও প্রতাপ বাবু এই রূপই আরাধনা করেন।

কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত প্রণালী, প্রতাপ বাবুর প্রণালী এবং

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। প্রথম অবলম্বিত আরাধনার অভিপ্রায় এই যে, মূল সংস্কৃত আরাধনা মন্ত্র যেমনটী আছে, তাহার অর্থও পর পর তেমন হইবে। মূল আরাধনা মন্ত্র এই ;—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ রূপমমৃতং
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

ইহার অর্থ এই ;—তিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয় এবং পবিত্রস্বরূপ। যদি আনন্দস্বরূপ সর্ব্ব শেষে ব্যাখ্যা করিতে চাও, তবে মূল মন্ত্রটীর মধ্যেও আনন্দস্বরূপ শেষে যোগ করিতে হইবে। কেবল ঢাকাস্থ নববিধানবাদিগণ সংস্কৃত আরাধনা মন্ত্রের মধ্যে আনন্দস্বরূপ সর্ব্ব শেষে যোগ করিয়াছেন।

প্রাচীন প্রণালীর পক্ষে এই বলা যাইতে পারে যে, আনন্দস্বরূপ পরে না বলিয়া মধ্যস্থলে বলিলে স্বরূপ সাধনের কোনই ব্যাঘাত হয় না। পরমেশ্বর যখন সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন সমুদয় স্বরূপবিশিষ্ট হইয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সুতরাং কোনও একটী আগে কোনও একটী পশ্চাতে বলিলে যে বিশেষ প্রত্যবায় ঘটে, সাধনার ক্ষতি হয়, এরূপ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে এ কথা সত্য যে, সামাজিক উপাসনায় একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। নতুবা উপাসকগণের যোগ দেওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সংস্কৃত আরাধনা মন্ত্র অনুযায়ী সেই ধারাবাহিক নিয়ম হইলেই স্বাভাবিক হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাই নিয়মই রক্ষা করিতেছেন। অর্থাৎ আরাধনা-মন্ত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে সকল

স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই রূপেই বাঙ্গলা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং আচার্য্য ও উপাসকের সহিত অমিল হয় না।

নববিধানবাদিগণ এ সম্বন্ধে এরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন যে, আনন্দস্বরূপ সর্ব্বশেষ ব্যাখ্যাত না হইলে, তাঁহারা উপাসনায় যোগ দান করেন না। এই জন্যই তাঁহারা অনেকেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের উপাসনায় যোগ দেন না। এমন কি নববিধানবাদী প্রতাপ বাবু সর্ব্বশেষে অদ্বিতীয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন বলিয়া, নববিধানভাবাপন্ন কেহ কেহ তাঁহার উপাসনাতেও যোগ দান করেন না। নববিধানবাদিগণ যে ঐ রূপ উপাসনায় যোগ দান করেন না, তাহার মধ্যে বোধ হয় এই কারণটী প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত আছে যে, কেশবচন্দ্র প্রবর্ত্তিত নিয়মাদি যাহারা পালন করিবে না, তাহারা বিধানবিরোধী। সুতরাং বিধানবিরোধীদিগের উপাসনায় তাঁহারা কি করিয়া যোগ দিবেন? বাস্তবিক আনন্দস্বরূপ সর্ব্বশেষ ব্যাখ্যা করিবার নিয়ম যদি ব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তিত না করিতেন, তবে নববিধান-বাদিগণ কখনও ঐ নিয়মটীকে এরূপ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতেন না।

শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু অদ্বিতীয়স্বরূপ সর্ব্বশেষে ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তিত প্রণালী অপেক্ষা প্রতাপ বাবুর প্রণালী অধিকতর উৎকৃষ্ট। নববিধানবাদী ব্রাহ্ম ভ্রাতা-গণ বলিয়া থাকেন, ধ্যানের পূর্ব্বে (আরাধনার শেষে) আনন্দস্বরূপ ব্যাখ্যা করিলে, উহা স্বাভাবিক হয়। কেন না ধ্যানের লক্ষ্য ভূমানন্দ লাভ করা। সুতরাং আনন্দস্বরূপ হইতে

ধ্যানের পথে উপনীত হওয়াই স্বভাবিক। এই যুক্তি সারগর্ভ নহে। ধ্যানের গভীরতায় সহিত আনন্দের উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু আনন্দ হইতে ধ্যানে যাওয়া স্বাভাবিক নহে। ধ্যানের পরেই ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়, অগ্রে নহে। ধ্যানের অবস্থা লাভ করিবার জন্য আরাধনা সাধন হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে যে স্বরূপটী চিন্তা করা হয়, তাহাই যদি ধ্যানের অবলম্বনীয় হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে ধ্যানের আয়োজন করা হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধ্যানের সময় আনন্দ, প্রেম ইত্যাদি স্বরূপসমন্বিত এক মাত্র সত্তাই সাধ্যবস্তু।

কিন্তু উক্ত নববিধানবাদিগণের যুক্তি অনুযায়ী বিচার করিলে, প্রতাপ বাবু যে সর্ব্বশেষ অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তাহাই ধ্যানে উপস্থিত হইবার অনুকূল পথ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কেন না এক মাত্র সত্তাই ধ্যানের বিষয়। অর্থাৎ অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকেই ধ্যান করিতে হইবে। সুতরাং অদ্বিতীয়স্বরূপ শেষে ব্যাখ্যা করিলে ধ্যানের সুবিধা হয় বৈকি। কিন্তু তাহাও ধ্যানের প্রকৃত পথ নহে। পবিত্রতাই সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যেই ধ্যানের উদয়। যাহা হউক, স্বরূপ বর্ণনায় অগ্র পশ্চাৎ লইয়া ঝগড়া বিবাদ করা, দলাদলী করা, উপাসনায় যোগ না দেওয়া ইত্যাদি অত্যন্ত কুসংস্কারের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আরাধনার সংস্কৃত মন্ত্র সকল ব্রাহ্মই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গলা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি মতভেদ হয়, তবে মনোভঙ্গের কারণ কেন হইবে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্কৃত মন্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যার নিয়ম রক্ষা করিয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। কেন না স্বরূপের অগ্র পশ্চাৎ ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইলে,

যদি সেই সকল স্থানে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তবে নানারূপ ব্যাখ্যার প্রথা সমাজে প্রচলিত হইবে। তাহা না হইয়া একটী সাধারণ মন্ত্র ও সাধারণ ব্যাখ্যা সামাজিক উপাসনায় প্রচলিত হওয়াই কল্যাণজনক। তাহাতে উপাসনার সামঞ্জস্য ও একতা রক্ষা হয়।

আরাধনার পরেই ধ্যান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এক মাত্র ব্রহ্ম সত্তায় নিমগ্ন হওয়াই ধ্যানের লক্ষ্য। আরাধনার সময়ে সাধক তাঁহার এক একটী স্বরূপ দেখেন, ধ্যানের সময় পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। কবির ভাষায় বর্ণন করিলে এইরূপ বলিতে হয়,—যেন এক জন সুন্দর পুরুষ দর্শন করিতেছি। তাঁহার অঙ্গ সমূহ একে একে দর্শন করিয়া বলিতেছি, "আহা কি সুন্দর হাতের গঠন, কেমন রঙ্গ" ইত্যাদি। তৎপর সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে যখন চিত্ত মগ্ন হইয়া গেল, তখন আর ভাষা, আলোচনা চিন্তা রহিল না, কেবলই মগ্নভাব, আনন্দ। তখন এক একটি অঙ্গ দেখা হয় না, পূর্ণ ভাবে সেই সৌন্দর্য্য সাগরে প্রাণ ডুবিয়া যায়। ইহারই নাম ধ্যান। এই জন্যই ধ্যানের সময় স্বরূপ চিন্তা থাকে না, তখন "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" তখন সাধক যেন আত্মহারা হইয়া সত্তা সাগরে নিমগ্ন হন।

নববিধান সমাজে সামাজিক উপাসনায় ধ্যানের পূর্ব্বে উদ্বোধন করা হয়। আচার্য্য আরাধনা শেষ করিয়া, অমনি এই মর্ম্মে উদ্বোধন করিতে থাকেন, যথা; "যিনি অন্তরে বাহিরে, সেই ব্রহ্মসত্তার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, আত্মা-পক্ষী ব্রহ্ম-বায়ুতে বিচরণ করুক, আমরা যাঁহার আরাধনা করিলাম, তাঁহার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই।" আরাধনার পরে এইরূপ

কথা বলা সঙ্গত নহে। এই জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, আরাধনার পরেই ধ্যান করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মাঝখানে উদ্বোধন করিবার নিয়ম রাখেন নাই। ঐরূপ উদ্বোধন করা যে অশোভন, তাহার কারণ এই, মনে করুন, উপাসক আরাধনা করিতেছেন। তিনি ঈশ্বরকে "তুমি সত্য তুমি জ্ঞান, তুমি পবিত্র ইত্যাদি বলিয়া শেষে যদি বলেন "আমরা যাঁহার আরাধনা করিলাম, এস এখন তাঁহার ধ্যান করি", তবে আরাধনার সহিত ভাবের মিল থাকে না। আরাধনার সময় 'তুমি' বলিয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া, শেষে "যাঁহার আরাধনা করিলাম, তাঁহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হই" ইত্যাদি কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

আমি একটি ছবি দেখিয়া বলিতেছি, "আহা ছবিটি কি সুন্দর, কেমন সুন্দর রঙ্গ, কেমন সুন্দর গঠন, দেখিয়া নয়ন জুড়াইল।" তৎপর যদি বলি, "যে ছবিটি এত সুন্দর, এস আমরা সেই ছবিটি দেখি" তবে শ্রোতারা মনে করিবেন যে, উনি এতক্ষণ বুঝি না দেখিয়াই ছবির এত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এখন দেখিবার দরকার হইয়াছে। বাস্তবিক নববিধান সমাজের ধ্যানের উদ্বোধন এইরূপই। অথচ বহুদিন হইতে এই প্রথা উক্ত সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

এক শ্রেণীর উপাসক আছেন, যাঁহারা আরাধনা করেন না, ধ্যান বা প্রার্থনা করেন না, কেবল কোনও নাম সর্ব্বদা স্মরণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, নাম আর পরমেশ্বরে কোনও প্রভেদ নাই। 'মা' বলিলে যেমন মায়ের গুণরাশী স্মৃতি

পথে আবির্ভূত হয়, একটী একটী করিয়া জননীর গুণ স্মরণ করিবার প্রয়োজন হয় না, এক 'মা' নামের মধ্যে জননীর স্নেহ, দয়া, বাৎসল্যভাব সকলই নিহিত আছে, তেমন তিনি সত্য, জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি না বলিয়া, কেবল কোনও একটী নামে ডাকিলেই সমুদয় স্বরূপসমন্বিত ঈশ্বরসত্তা প্রাণে উপস্থিত হয়। নামের মধ্যে সকলই আছে। উদ্বোধন বল, আরাধনা বল, ধ্যান বল, প্রার্থনা বল, নামেতে সকলি আছে। নাম কেবল শব্দ নহে, নামই পরমব্রহ্ম।

যাঁহারা প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনা সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা অন্য রূপ, তাঁহারা বলেন, কেবল নামসাধন করিলে সম্পূর্ণ সাধন হয় না, কেবল নামসাধন একাঙ্গ সাধন—তাহাকে পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন বলা যায় না। ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা, ধ্যান, প্রার্থনা দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে ; যে উপাসনায় মুখ্যরূপে ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থনা নাই, সেই উপাসনায় মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার সহিত জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যাঁহারা কেবল নাম সাধন করেন,—আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান করেন না, তাঁহারা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না। যাঁহারা আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি নাম সাধন করেন না ? করেন বৈ কি, এবং সেই নাম সাধন-প্রণালীই উৎকৃষ্ট। তাঁহারা সাধনীয় বিষয় গুলি কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবার জন্য নাম জপ করেন। নাম তাঁহাদের পক্ষেই প্রকৃত কল্যাণপ্রদ। তাঁহারা আরাধনার মন্ত্র, ধ্যেয়বস্তু, এবং প্রার্থনার ভাব সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিবার জন্য

নাম করিয়া থাকেন। যে ঈশ্বরের তাঁহারা আরাধনা করিয়া থাকেন, যাঁহার ধ্যান করেন, মুক্তির জন্য যাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, নাম স্মরণ করিলে তাঁহাদের স্মৃতিপথে সেই ঈশ্বরের ভাব জাগ্রত হইয়া থাকে। যাঁহারা ঐরূপে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করেন না, কেবল নাম করেন, তাঁহারা সুফল লাভ করিতে পারেন না। এবং তাহাদের জীবনে ও কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

আরাধনা-ব্যাখ্যা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

তুমি সত্যস্বরূপ—তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি মূলাধার, তুমি সকলের আশ্রয় ও অবলম্বন। ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে বিধৃত রহিয়াছে। নানাভাবে নানাদেশে লোকে তোমাকেই ডাকে, তোমারই শরণাগত হয়, প্রাণমন্দিরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কৃতার্থ হয়। সত্যের জন্য, তোমার জন্য সকলেই কাঙ্গাল। যে জন্য নরনারীর প্রাণ লালায়িত, সেই মহাসত্য তুমি। তুমিই নিগূঢ়তত্ত্ব। অতি নিভৃত স্থানে, এমনি অগ্নিময় অক্ষরে তোমার সত্তা মানবের প্রাণে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে যে, সকলেই মনে মনে তোমাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সমস্ত বিশ্ব সমস্বরে তোমারি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। সকল লোক, সকল শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করে, এই পরিবর্ত্তনশীল কাল-

প্রবাহের মধ্যে নিত্য কে স্থায়ী? আর তুমি প্রাণের ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিতেছ, "আমি প্রথমে ছিলাম, এখনও আছি এবং অনন্তকাল থাকিব।" তুমি নিত্যস্থায়ী, নির্ব্বিকার, প্রাণস্বরূপ সর্ব্বগত জীবন্ত অন্তরাত্মা তুমি।

তুমি জ্ঞানস্বরূপ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার জ্ঞানের প্রকাশ। তুমি সুগভীরতত্ত্ব। অচেতন সচেতন সকলই তোমার সত্তাতে উজ্জ্বল। সকল শাস্ত্র কাহার মহিমা প্রকাশ করে, সকল বিজ্ঞান কাহার জ্ঞান ব্যক্ত করে, দূরবীক্ষণ কাহার জ্ঞানের কার্য্য দেখাইয়া দেয়, অণুবীক্ষণ কাহার রচনা আবিষ্কার করে? সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যক্ষ তুমি। তুমি বিবেকরূপে, প্রজ্ঞারূপে মানব অন্তরে বাস করিয়া শ্রেয় কি প্রেয় কি তাহা বলিয়া দিতেছ, ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছ। তুমি পরমগুরু, পরমাচার্য্য। মানব অন্তরে নিয়ত তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছ।

তুমি অনন্তস্বরূপ—হে মহাসত্তা! তুমি বলিয়া আমরা কাহাকে সম্বোধন করি, তুমি কে? তোমার আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হওয়া কি স্পর্দ্ধা নয়। এই মহাকাশ তোমার সত্তাতে বিলীন হইল। কালত্রয় তোমাতে বিলীন হইয়া গেল। ঋকবেদী ঋষিগণ মহানদী তীরে, সূফীগণ আরবের প্রান্তরে এবং সেইণ্টগণ পশ্চিম দেশে তোমার তত্ত্ব উচ্চারণ করিতে গেলেন, আর বলিতে পারিলেন না। জিহ্বা নিস্পন্দ হইল। কত শাস্ত্র তোমাকে বলিতে চায়, বলিতে না পারিয়া ক্ষীণ হয়। তুমি কে, তুমি কোথা, তুমি কি? তুমি অন্ধকার মগু, অথচ তুমি জন্ম মৃত্যুর ভিতর রহিয়াছ। হে অনন্ত!

তুমি প্রেমেতে, জ্ঞানেতে, সৌন্দর্য্যে চিরনবীন হইয়া আছ। চেতন ও জড়ের বৈচিত্র তোমা হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। তোমার বিষয় বলিতে বলিতে কণ্ঠ নিরোধ হয়। বিশ্বভুবন এক তানে বলে "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর।" তুমি অগম্য অপার অনাদ্যনন্ত মহান্ পরিপূর্ণ।

তুমি আনন্দস্বরূপ—তুমি আনন্দ রূপে, অমৃত রূপে মানব অন্তরে বাস করিতেছ। তুমি দুঃখীকে সুখীকর, অমৃত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা হরণ কর। জননীর স্নেহে, দাম্পত্য প্রেমে, সাধুসমাগমে তোমার আনন্দজ্যোতি প্রস্ফুটিত হয়। তোমার মুখের সৌন্দর্য্য সূর্য্যের উদয়াস্ত; তোমার সৌন্দর্য্যে বাগানের রাশি রাশি ফুলফুটিল, নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া নানাদিকে চলিল। তোমার নামে সাধুর মুখ হইতে কত বন্দনাধ্বনি উঠিতেছে, তোমার আনন্দে ত্রিভুবন মাতিয়াছে।

তুমি শান্তিস্বরূপ—প্রাণারাম তুমি। তুমি মানব হৃদয়ে পাপের ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রদান কর। প্রাণ জুড়াইবার স্থান তুমি। তোমাকে পাইলে মানব মন সুখে উৎফুল্ল এবং দুঃখে ম্রিয়মান হয় না, প্রকৃত শান্তি লাভ করে। প্রশান্ত চিন্ময় মূর্ত্তি তুমি। তোমাকে পাইয়া তৃষিত ও তাপিত আত্মা শান্তি ভোগ করে।

তুমি মঙ্গলস্বরূপ—অসীম গৌরবে পূর্ণ হইয়াও আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের প্রতিও তোমার কত স্নেহ। পৃথিবী স্বার্থের অনুরোধে অভিভূত। এখানে কিছুরই স্থিরতা নাই। এমন নিরাশ্রয় স্থানে দীন জনকে প্রতিপালন

করে কে? তোমারই করুণা। তোমারই করুণা আমাদিগকে ইহসংসারে আনিয়াছে এবং তোমারই করুণা নিয়ত প্রতি-পালন করিতেছে। এখানে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। তাহাদের কুটীরে কে অন্ন পরিবেশন করে? কাহার করুণা মাতৃহীন অনাথ সন্তানকে তুলিয়া লয়? সন্তানবিহীন মাতাকে কে সান্ত্বনা দেয়? পীড়িত দরিদ্রের শিয়রে আত্মীয় নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, প্রাণ বাহির হইয়া গেলে কে তাহাকে অমৃতধামে লইয়া যায়? জননি! তোমার অঞ্চল ধরিয়া জগতে আসিয়াছিলাম, কেবল মাত্র দুর্ভাগ্য বহন করিলাম, এক্ষণে তোমার দয়া ভিন্ন আর কিসের দিকে দৃষ্টিপাত করি? যাহা হয় হউক, যাহা ঘটে ঘটুক, শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ধরিয়া থাকিব। তুমি দীনবন্ধু, মঙ্গলময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, গুণের আকর, প্রেমের সাগর। তুমি আমাদের আত্মাতে কি নিহিত করিয়া দিলে যে, তোমাকে ছাড়িয়া সুখী হইতে পারি-লাম না। রাজা, সিংহাসন ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইলেন! তোমার জন্য কত নরনারী কত নির্যাতন অকাতরে সহ্য করিল; প্রসূতী সন্তান ছাড়িয়া তোমারই জন্য তীর্থে গমন করিল, কত শত লোক সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য লইল। আমরা যদি এতদূর করিতে না পারি, তবে উদ্ধার হইব কিসে? আমাদের ধর্ম্মের এতই গৌরব যে, তোমাকে পাইয়া আমরা তীর্থ পাই। তোমার নাম গানই আমাদের তপস্যা।

তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্—সমুদয় বর্ণস্রোত তোমাতে একাকার হইয়া গেল। গৌরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ তোমার এক পরিবার ভুক্ত হইল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকলে মিলিয়া বলিল

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" দেবাধিদেব, রাজাধিরাজ, অবনীর তুমি তুমি আদ্যাশক্তি, সকল শক্তির মূল শক্তি, সকল কারণের আদি কারণ, সকল তত্ত্বের এক মাত্র মূলতত্ত্ব।

তুমি পবিত্রস্বরূপ—তুমি যদি আমাদিগকে প্রেম ভক্তি করিতে বাধ্য করিতে, তোমার কার্য্য সহজ হইত। কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে পবিত্রধামে লইয়া যাইতে চাও। এক হস্তে তুমি পালন কর, এক হস্তে এমনই শাসন কর যে, তোমার বজ্রে আমাদিগের পাপহৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। তোমার চিন্তায় অপবিত্র আত্মা নির্ম্মল হয়। তুমি যুগে যুগে কত পাপী উদ্ধার করিলে। তুমি ধর্ম্মবহ পাপনুদরূপে মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছ। হে পরব্রহ্ম, তুমি মানব অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ নিয়ত প্রকাশ করিতেছ, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক তুমি। আমরা পবিত্র হইয়া তোমাতে প্রবেশ করি। সচ্চিদানন্দ তুমি। আমরা কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের জন্য তোমার উপাসনা করি না। আমাদের আত্মার উন্নতির জন্য তোমাকে পূজা করি, তোমার শরণাপন্ন হই। *

বিবেক।

ঈশ্বর মানুষের সহিত কথা বলেন, উপদেশ দেন এবং মানবের ধর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করেন্। কিরূপে তিনি কথা বলেন? মানুষকে উপদেশ দিবার জন্য তিনি কি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি জড়ীয় উপায় অবলম্বন করেন? পত্র না লিখিলে,

* সংশোধিত আকারে সংগৃহীত।

টেলিগ্রাফ্ না করিলে দূরস্থ ব্যক্তির সহিত কথা বার্ত্তা চলে-না, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিকটস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপাদি করি। ঈশ্বর ত এ সকল কিছুই অবলম্বন করেন না। তবে কিরূপে উপদেশ দেন, কথা বলেন ?

আধ্যাত্মিকতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার জড়তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই যে আমরা আহার করি, নিদ্রিত হই, ঈশ্বর কি মানুষের মত আসিয়া,আমাদিগকে ঐরূপ করিতে বলিয়া যান ? দুপ্রহর বেলা হইয়াছে, তিনি কি কোন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে থাকেন, "হে আমার সন্তানগণ ! তোমরা এখন আহার কর ?" এরূপ বলেন না ; কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতররূপে আহার করিতে আদেশ করিতেছেন। সে আদেশ কিরূপে টের পাই ?

বুদ্ধিদ্বারা নহে। আমরা কি এইরূপ পরামর্শ করিয়া আহার করি যে, "এস হে এখন আহার করা যাউক, নতুবা স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে না, শরীর রক্ষা হইবে না ?" আসল কথা, ক্ষুধার উদ্রেক হয় বলিয়াই আহার করি। এই ক্ষুধা আর কিছুই নহে, আহার করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ। যেরূপে আমাদিগকে চলিতে হইবে, তাহা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা আদেশ করিতেছেন। তিনি মুখে বলেন না, "আহার কর, শয়ন কর, পান কর" ; কিন্তু ঐ ক্ষুধা পিপাসা ইত্যাদির মধ্যে তাঁহারই ইঙ্গিত দেখিতে পাই। এই ইঙ্গিত অনুসারে চলিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। ইহাকেই শারীরিক আদেশ বলা যাইতে পারে। মনোরাজ্যে ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতররূপে আদেশ অনুভব করা যায়।

মানব অন্তরে দুইটী জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত আছে। একটীকে বুদ্ধি, আর একটীকে প্রজ্ঞা বলা যাইতে পারে। যে জ্ঞান আমাদের অধীন অর্থাৎ আমাদের আত্মার অধীন, তাহাকেই দার্শনিকগণ বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, এবং আমাদের আত্মা যে জ্ঞানের অধীন অর্থাৎ আত্মা যে জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাই প্রজ্ঞা বা বিবেক। বিষয়টী একটু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করি।

আমরা সাংসারিকভাবে, সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানে, সাংসারিক লাভ লোকসান গণনা করিয়া যে সকল কার্য্য নিয়ত করিতেছি—যাহার সহিত ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে—মস্তিষ্ক আলোড়নদ্বারা যে জ্ঞান বিকশিত হইতেছে—উকিল, বারিষ্টার, বিচারক যে জ্ঞান লইয়া পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন, তাহাই বুদ্ধি জাতীয়। আর যে জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরসত্তা অনুভূত হয়, জীবে ব্রহ্মে যোগ স্থাপিত হয়, ইহপরলোক-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, প্রাণে ভক্তিরস সঞ্চারিত হয় তাহাই প্রজ্ঞা। সমুদ্রে দুই প্রকার স্রোত আছে; এক প্রকার স্রোত সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আর এক প্রকার স্রোত অতি গভীর স্থানে হয়ত অন্য দিক দিয়া বাহিত হইতে থাকে। এইরূপ মানবের বিষয়কর্ম্মে এক প্রকার জ্ঞান বিকশিত হইতেছে এবং হৃদয়ের অন্তস্তলে অতি গভীরতম প্রদেশে আর এক প্রকার জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমটী বুদ্ধি, দ্বিতীয়টী প্রজ্ঞা। হিন্দুশাস্ত্রে এই প্রজ্ঞা বা বিবেক অতি স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সাঙ্খ্যদর্শনের মতে দুঃখ ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। এই ত্রিবিধ

দুঃখ বিনাশের উপায় নির্দ্ধারণই সাঙ্খ্য দর্শনকারের লক্ষ্য। এই প্রশ্নের উত্তরে দর্শনকার বলিতেছেন যে, বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই এইরূপ মুক্তি সাধনের একমাত্র উপায়। ন্যায়দর্শন মতে জীবাত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানাকেই বিবেক বলে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও বলিয়াছেন, "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।" এখানেও বিবেক অর্থ প্রজ্ঞা বা ব্রহ্মজ্ঞান।

সাধারণতঃ লোকে বিবেকের এক প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। সেই অর্থ এই যে, বিবেক বুদ্ধিরই উৎকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র। এই শ্রেণীর লোকে বলেন—শিক্ষা, সমাজ, সংসর্গ ফলে বিবেকও উৎকর্ষ বা মলিনতা প্রাপ্ত হয়। যখন দেখিতেছি, অসভ্যদিগের বিবেক মাতৃহত্যা অনুমোদন করে, বৈষ্ণবের বিবেক পশুহত্যা পাপ মনে করে; শাক্তের বিবেক নরবলিদান পুণ্য কার্য্য বলিয়া করে, তখন বিবেককে বুদ্ধিজাতীয় বলিয়াই মনে হয়। যার যেমন বুদ্ধি অর্থাৎ শিক্ষা, সংসর্গ এবং সমাজদ্বারা যে ব্যক্তি যেমন বুদ্ধি লাভ করিয়াছে, সে তেমনই কায করিতেছে। তাহার ধর্ম্ম ও তাহার মত, তাহার বুদ্ধির অনুযায়ী হইতেছে। এই বুদ্ধি ভিন্ন, বিবেক বলিয়া আর একটা কিছুই নাই। যদি বা অন্তরে থাকে, কিন্তু তাহা আলোচ্য বিষয় নহে, কেননা তাহার ফল ত আমরা দেখিতে পাই না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধিরই ফললাভ করিয়া থাকি। জগতে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারাই জয়লাভ করিতেছেন এবং নির্ব্বোধেরা বুদ্ধিমানদিগের দাসত্ব করিতেছে।

বুদ্ধিকে আমরা উপেক্ষা করি না। বুদ্ধির উন্নতি ভিন্ন জগৎ বর্ত্তমান উন্নতাবস্থায় কখনও উপনীত হইতে পারিত না।

বিজ্ঞান ও শিল্পের এত উন্নতি বুদ্ধিমানের দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু বক্তব্য এই, এই বুদ্ধি মনোরাজ্যের ব্যাপার মাত্র, পার্থিব বিষয়েই পর্য্যবসিত। মানববুদ্ধি পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের চক্ষের দৃষ্টি যেমন চক্রবাল (আকাশ-প্রান্ত-রেখা) ভেদ করিয়া আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না, বুদ্ধির গতিও তেমনি। জাগতিক সীমায় আবদ্ধ। এই জন্যই যাঁহারা বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা হয় নাস্তিক, না হয় সন্দেহবাদী, অথবা অজ্ঞেয়তাবাদী হইয়াছেন। এই বুদ্ধির স্তর ভেদ না করিলে মানুষ প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। একজন বঙ্গীয় সুলেখক বলিতেছেন;—

"মনুষ্যের অন্তর মধ্যে কন্‌সেন্স নামে একটা কি আছে, সে সকল সময়ই মনুষ্যের মনোমধ্যে অশান্তি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই কন্‌সেন্সের দর্শন-শাস্ত্রসঙ্গত অভিধান যাহাই হউক, চলিত বাঙ্গালাতে আমরা উহাকে "সহজ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি" আখ্যা দিতে পারি। মানুষ যখন এদিক যাইতে চায়, তখন ঐ প্রবৃত্তি উহাকে ওদিকে টানে। ধর্ম্মশাস্ত্র, লোকশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় পিনালকোড যখন মনুষ্যকে এ পথে যাইতে বলে, তখন উহা অন্যপথ দেখাইয়া দেয়। যত্রতত্রই মনুষ্যের ঘরে ও বাহিরে কুত্রাপি শান্তি নাই। মনুষ্যের অন্তরের ভিতরে এই একটা বিদ্ভুত কিমাকার প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সর্ব্বদা কলহে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং গুরু, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, অনুরোধ উপদেশ ও নীতিপ্রদর্শনদ্বারা মনুষ্যের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা সকল অনুরোধ

ও উপদেশ উপেক্ষা করিয়াও সকল ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া অন্তর্মার্গ দেখাইয়া দিতেছে।"

"মানুষ যখন নিজের প্রবৃত্তি সমূহের প্ররোচনায় অথবা বন্ধুবর্গের উপদেশ বাক্যে একটা গন্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, এমন সময় তাহার অন্তরতম প্রদেশের কোথা হইতে কাহার ধীর গম্ভীর স্বর উত্থিত হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। প্রবৃত্তির প্ররোচনা তখন আর তাহাকে চালাইতে পারে না, হিতৈষীর হিতবাণী তখন আর ভাল লাগে না; শাস্ত্রের শাসন আর তখন সম্মান পায় না; ইউটিলিটিতত্ত্ব বক অন্যান্য দার্শনিকতত্ত্বের ক্ষতিলাভ গণনা ও হিসাব নিকাশের তখন আর অবকাশ মিলে না।"

বুদ্ধি যখনই আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে, ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করে, তখন উহা ঈশ্বরেরই আদেশ। সুবুদ্ধি সয়তানের খেলা নহে। কিন্তু প্রজ্ঞা বা বিবেকরাজ্যে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয় না। বুদ্ধিদ্বারা আমরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করি তাহা দূরের ঈশ্বর। সে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার নিকট সম্বন্ধ কোথায়? কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করিয়া যখন প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার আদেশ, উপদেশ লাভ করি, তখনই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান হয়। এই প্রজ্ঞা বা বিবেকের আদেশেই মহাত্মা মহম্মদ, দেব দেবী পূজা রহিত করিয়া এক মাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এই বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়াই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদপ্রপীড়িত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিরাকার পরব্রহ্মের বিশ্বজনীন উপাসনা প্রচার

করিয়াছিলেন। এই বিবেক বা প্রজ্ঞা লইয়াই ধর্ম্ম, ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, সাধন ভজন হয় না, মুক্তি লাভ হয় না।।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের উপায় আছে; বিদ্যালয়ে শিক্ষা, বিদ্বান সমাজে বাস, পুস্তকাদি অধ্যয়নদ্বারা বুদ্ধিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। প্রজ্ঞা বা বিবেকের উৎকর্ষ সাধনের উপায় কি? তাহার উপায় আছে বৈ কি? বিবেকের আদেশ পালন করিলেই বিবেক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। অর্থাৎ সত্যানুসরণ, পবিত্রতা ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরোপাসনাদ্বারাই প্রজ্ঞা বা বিবেক ক্ষূর্ত্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি এ সকল অনুষ্ঠান করে না—বিবেকের আদেশ পালন করে না অর্থাৎ মিথ্যা ব্যবহার, অপবিত্র চিন্তা ও অহিত কার্য্যে কাল যাপন করে, তাহার বিবেক মলিন হইয়া যায়। শিক্ষা দ্বারা মানুষ যেমন বাহ্যজ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়, তেমন অভ্যাস দ্বারা আন্তরিক জ্ঞানেরও উৎকর্ষ হয়। সেই অভ্যাসের নামই ধর্ম্মসাধন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মসাধন করে না, তাহার পক্ষে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা, প্রজ্ঞা বা বিবেকের রাজ্যে বাস করা অসম্ভব। যে ব্যক্তি দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষা করে নাই, সে যেমন দর্শন বিজ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে, তেমন যাহার অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে কি করিয়া আধ্যাত্মিকতত্ত্ব লাভ করিবে? বধিরের পক্ষে সুললিত সংগীত, অন্ধের পক্ষে সুশোভনচিত্র, যেমন কোনই কার্য্যকরী নহে, তেমনি সাধনবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে প্রজ্ঞা, বিবেক বা ঈশ্বরবাণীর অস্তিত্বই নাই। তাহারা বুদ্ধির রাজ্যে বাস করে, বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, বুদ্ধির মহিমা কীর্ত্তন করে। বুদ্ধিতে যতটুকু আয়ত্ত করিতে

পায়ে, তাহাই তাহাদের আলোচ্য বিষয়। বুদ্ধির পরপারে তাহাদের যাইবার অধিকার নাই।

কিন্তু এখানে ইহা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলিলাম, তাহা মূলতঃ জ্ঞানেরই নিম্নতম অংশ। এক অখণ্ড জ্ঞানই রাজত্ব করিতেছে। এই জ্ঞান নানা স্থানে নানারূপে প্রকাশিত। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সহজজ্ঞান, বিবেক ইত্যাদি এক একটী স্তর মাত্র। যে জ্ঞান ধর্ম্মাধিকরণে রাজবিধিরূপে প্রকাশিত, বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান, দার্শনিকের নিকট দর্শন, ঐতিহাসিকের নিকট ইতিহাসরূপে প্রকাশিত, সেই জ্ঞানই আবার মনের মধ্যে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা ঈশ্বরবাণীরূপে প্রকাশিত। এই বুদ্ধি, সহজজ্ঞান, প্রজ্ঞা সকলেরই স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। যিনি ধর্ম্মপথযাত্রী, তিনি সকলের মাহাত্ম্যই অনুভব করেন, এবং দেশ ভ্রমণকারিদিগকে যেমন জলযান, ঘোটক-যান, রেলগাড়ী, প্রভৃতি সকল প্রকার বাহনই ব্যবহার করিতে হয়, তেমনি ধর্ম্মসাধনার্থিগণ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকলেরই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুদ্ধির কার্য্য বুদ্ধি করে, প্রজ্ঞার কার্য্য প্রজ্ঞা করে।

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই প্রজ্ঞা বা বিবেককে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন বুদ্ধির শরণাপন্ন হইতেছেন, এবং বুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়া, যেমন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের উচ্চতমস্তর হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তেমনি আবার একদল ধর্ম্মসাধক বুদ্ধিকে পরিহার করিয়া, লৌকিকজ্ঞান, ভৌতিক-জ্ঞান ইত্যাদি পরিহার করিয়া কেবল আধ্যাত্মিকজ্ঞান লাভের জন্যই প্রয়াসী হইতেছেন। তাঁহারা যেন সংসার হইতে বিদায়

গ্রহণ করিয়া নিয়ত কেবল অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন। এই দুই পথই পরিত্যাজ্য। মধ্য-পথ অবলম্বনীয়। বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। একদিকে যেমন ভৌতিকজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে ঈশ্বরবাণী শুনিবার জন্য আকুল হইতে হইবে। এইরূপ সাধনই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত। উপরে যে দুইটী পথের কথা উক্ত হইল, তাহার প্রথমটী পাশ্চাত্য এবং শেষোক্তটী প্রাচ্য। পাশ্চাত্যশিক্ষা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে তৎপর, প্রাচ্যশিক্ষা বুদ্ধিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, কেবলই অন্তরে প্রবেশ করিবার উপদেশ দেয়। এই দুইয়ের সম্মিলন, ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, তুমি বুদ্ধিতে উন্নত হও, প্রজ্ঞাতে উন্নত হও।

অতি সংক্ষেপে বিবেকের মূল প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলাম, বিবেকই আমাদের পরিচালক, বিবেকই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, বিবেকই ঈশ্বরবাণী। এই বিবেকের আদেশানুসারে চলিলেই মোক্ষলাভ হয়।

পাপ।

পাপ কি? হিন্দুসমাজ বলিতেছে, পাপ দুই প্রকার জ্ঞানকৃত-পাপ, এবং অজ্ঞানকৃতপাপ। তুমি জানিয়া শুনিয়া যে মন্দ কায কর, তার ত ফলোভোগ করিবেই; কিন্তু তোমার অজ্ঞতার জন্য যে অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফলও তোমাকে

ভোগ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অজ্ঞানকৃত পাপের ফলে নরক দর্শন করেন।

যেরূপ পাপই হউক না, তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই। ইহলোকে না হয়, পরলোকে অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপের শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। রাম গরু চুরি করিয়াছে, সে মারা গেল। পুনরায় দেহধারণ করিয়া ভয়ানক ক্লেশ পাইতে লাগিল। মানুষ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ইহজন্মে ভোগ করে, অথবা ইহজন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে ভোগ করিবে।

এই যে সংসারে দেখিতেছি, কেহ রাজা হইয়া সকলের উপরে একাধিপত্য বিস্তার করেন—লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়; অপর দিকে কেহ দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনাহারে, নানা প্রকার কষ্টে মৃতপ্রায় কাল যাপন করে; কেহ বিদ্বান বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ; কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত; কেহ পাপে তাপে জর্জ্জরিত, কেহ পুণ্য সলিলে স্নাত, কেহ রোগজীর্ণ, কেহ সুপুষ্ট, ইহার কারণ কি? হিন্দুগণ এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, "পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফল অনুসারে ইহলোকে ঐরূপ ভোগ হইতেছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই ইহার একমাত্র কারণ।"

এইরূপ উত্তর পাইয়া হিন্দুগণ আশ্বস্ত হন বটে; "আর কি করিব, পূর্ব্বজন্মে যেমন কায করিয়াছিলাম, ইহজীবনে তার ফলভোগ করিতেছি।" এরূপ ভাবিয়া ভরসা পান বটে; কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, এই প্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক ও অমূলক। অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে একটী কথা বলিতেছি। মানবসৃষ্টির আদি আছে, এক সময় মানুষ ছিল না,

তার পর হইল, ইহা হিন্দুগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন 'মনু হইতে মানুষের সৃষ্টি।' এখন প্রশ্ন এই, জীবাত্মা যদি সৃষ্টই হইল, তবে তাহার পূর্ব্বজন্ম কি করিয়া থাকিবে? অর্থাৎ প্রথম যখন মানব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের পূর্ব্বজন্ম ত ছিল না। তবে তাহাদের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, কিরূপে নিয়মিত হইল?

তার পর প্রশ্ন এই, ধরা গেল যে, কতকগুলি মানুষকে বিধাতা সৃষ্টি করিয়া আপন ইচ্ছামত কাহাকে সুখে, কাহাকে বা দুঃখে রাখিলেন, ইহার পর হইতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ আরম্ভ হইল। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে। মনে করা যাউক, ঈশ্বর যেন সর্ব্বপ্রথমে এক কোটী মানব সৃষ্টি করিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি আত্মা (হিন্দু শাস্ত্র মতে) নির্ব্বাণ মুক্তি পাইল, কতকগুলি নরকবাস করিতে লাগিল, বাকী কয়েকটীর মধ্যে কাহারও পশুকুলে জন্ম হইল; অতি অল্প সংখ্যক হইল মানুষ। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা হইলে বিধাতাকে আরও নূতন আত্মা সৃষ্টি করিতে হয়। নূতন আত্মা সৃষ্টি করিতে হইলেই সে সকল আত্মার পূর্ব্বজন্ম থাকে না। হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

হিন্দু শাস্ত্রের দার্শনিক মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম নিয়তই আধার ও আধেয় হইয়া আছেন; কিন্তু অবিদ্যার আচ্ছাদনে আবৃত থাকায় জীবের ব্রহ্মানুভূতি হইতেছে না। অবিদ্যাই পাপের জননী, অবিদ্যার পাশ ছিন্ন না হইলে ব্রহ্মলাভ হয় না। অবিদ্যা পাপ, জীব অবিদ্যাতে অভিভূত, সুতরাং পুণ্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে সে প্রাপ্ত হয় না। এই অবিদ্যা ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়া-

ছেন। এখন প্রশ্ন এই, পরমেশ্বর স্বীয় স্বরূপের বিরোধী বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন কি না? অজ্ঞানতা সৃষ্টপদার্থ কি না?

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানই যাঁহার স্বভাব, সেই পরমজ্ঞান কখনও অজ্ঞানতার উৎপাদক হইতে পারে না। ঈশ্বর আত্ম বিনাশী হইতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্টি অসৎ নহে—মিথ্যা নহে; কেন না সেই সত্যস্বরূপেই সকল ধৃত রহিয়াছে। যে জড় জগৎকে হিন্দুশাস্ত্রে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, সেই জড় জগৎ জ্ঞানাধীন বস্তু, জ্ঞানাশ্রিত, জ্ঞানেরই একাঙ্গ, মিথ্যা নহে, মায়া নহে।

পাপ কি সৃষ্ট বস্তু? পাপ অভাবাত্মক বিষয়, অভাবাত্মক যাহা তাহা কখনও সৃষ্ট হইতে পারে না। আলো ভাবাত্মক, আলো সৃষ্টপদার্থ; অন্ধকার অভাবাত্মক অন্ধকার সৃষ্ট নহে; তেমনি পুণ্য ভাবাত্মকবিষয়, পুণ্য—পুণ্যস্বরূপেরই প্রকাশ; কিন্তু পাপ অভাবাত্মক, পুণ্যের অভাবই পাপ, সুতরাং পাপ সৃষ্ট নহে। পুণ্যস্বরূপ যিনি, তিনিই পাপের স্রষ্টা,—ইহা নিতান্তই স্ববিরোধী কথা।

হিন্দুগণের ন্যায় বৌদ্ধগণও জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দ্বিবিধ অন্যায় কার্য্যকেই পাপ বলিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিতেছেন,—যখন মানবদম্পতী সর্ব্বপ্রথমে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পাপ ছিল না। এমন কি তাঁহারা লজ্জা কি পদার্থ তাহা জানিতেন না, মনের আনন্দে স্বর্গের উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সয়তানের

কুহকে পড়িয়া যেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করিলেন, অমনি তাঁহাদের মধ্যে পাপ সঞ্চারিত হইল—তাহারা নগ্নদেহে থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে মানুষের মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বলিতেছেন ? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, অজ্ঞানতা পাপ নহে, যাহা তুমি যত ক্ষণ পাপ বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিতেছ না, তাহা তোমার নিকট পাপ নহে ; জানিয়া শুনিয়া মন্দ কায করা, যাহা পাপ বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা করাই পাপ। অর্থাৎ অজ্ঞানকৃতপাপ, পাপ নহে ; জ্ঞানকৃত পাপই পাপ। অজ্ঞানকৃতপাপকে মোহ বলা যাইতে পারে। অজ্ঞান অবস্থাকে কেন আমরা পাপ বলিতেছিনা, তাহার কারণ আছে।

হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মসম্প্রদায় কোন্ মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া পাপ পুণ্যের বিচার করেন ? শাস্ত্রই তাঁহাদের পাপ ও পুণ্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়। সুতরাং অজ্ঞানকৃত পাপকে তাঁহারা ত পাপ বলিবেনই। শাস্ত্রের নিষেধ পাপ, এবং বিধিই তাঁহাদের কাছে পুণ্য বলিয়া অভিহিত। এই সকল শাস্ত্রে, কোন্ কোন্ কার্য্য পুণ্য ও কোন্ কোন্ কার্য্য পাপ, তাহার তালিকা আছে। লোকে সেই অনুসারে চলে। শাস্ত্রের নিষেধ ও বিধি অনুসারে না চলিলেই তাঁহারা পাপ হইল বলিয়া মনে করেন।

রাজা আইন করিয়াছেন, নরহত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয়। কেহ যদি দণ্ডবিধির ঐ ধারা না জানিয়াও হত্যা করে, তবু সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। "আমি আইন জানি না," বলিয়া উত্তর দিলে বিচারক তাহাকে মুক্তি দিবেন না।

পার্থিব বিচারপতির এই বিচারপ্রণালীর ন্যায় স্বর্গের রাজাও বিচার করেন। তাঁহার কাছেও এই কথা বলিলে চলিবে না যে, "প্রভো আমি অজ্ঞানতা বশতঃ যে পাপ করিয়াছি তাহার শাস্তি দিও না।" তিনি বলিবেন, "তুমি অজ্ঞানতা বশতঃই হউক আর জানিয়া শুনিয়াই হউক যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তজ্জন্য নরকভোগ করিবেই!"

ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন আদর্শ ধরিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, শ্রেয়ঃ কি প্রেয়ঃ কি, পাপ কি পুণ্য কি, ভাল কি মন্দ কি, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি, তাহা ঈশ্বর নিয়ত মানব-অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন। যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি আমরা চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি, তেমনি সহজজ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেকদ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমরা অবগত হই। উক্ত উপায়ে ঈশ্বর আমাদিগকে সকল কথা বলিয়া দিতেছেন। আমরা কি করিব, কোন্ পথে যাইব, কি রূপে চলিব ইত্যাদি সকল গুহ্যতত্ত্ব আত্মাতে তিনি প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু অনেক সময় মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে ভুল করিয়া থাকে। নিজের খেয়াল, অভিরুচি এবং প্রবৃত্তির পরিচালনাকে ঈশ্বরের আদেশ অথবা তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে করে। এই জন্য হৃদয়ের অনুভূতির সহিত শাস্ত্র, সাধুজনের উপদেশ ও আচরণ মিলাইয়া দেখিতে হয় যে, কোন্‌টী ঈশ্বরের আদেশ, আর কোন্‌টী প্রবৃত্তির খেয়াল।

এইরূপে যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাই পাপ। পাপ-বোধ না জন্মিলে পাপ কি তাহা জানা যায় না।

ঈশ্বর মানবপ্রাণে পাপকে পাপ বলিয়া পরিচয় করিয়া দেন এবং সেই পাপ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পরিত্যাগের জন্য ইচ্ছারও উদ্রেক করেন। এই জন্যই পাপ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য দায়িত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, পাপ নিরপেক্ষ, না আপেক্ষিক। নিরপেক্ষ কাহাকে বলে? যে কোন বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা রাখে না, অপেক্ষারহিত—স্বতন্ত্র—স্বাধীন; যে কোন বিষয়ে কাহারও অনুরোধ শুনেনা, কোন ঘটনার, বা অবস্থার দাস নহে, স্বতঃই যে নিজের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান, তাহাই নিরপেক্ষ। পরন্তু আপেক্ষিক কাহাকে বলে? অপেক্ষাকৃত—তুলনাকৃত। যেমন আপেক্ষিকগুরুত্ব, অর্থাৎ বাস্তবিক গুরুত্ব নহে; কিন্তু অন্যের সহিত তুলনা করিলে গুরুত্ব বুঝায়; ঘটনা, অবস্থা, কার্য্যদ্বারাই যাহার সাময়িকঅস্তিত্ব প্রকাশ পায়। যাহার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আকৃতি নাই, তাহাই আপেক্ষিক। যাঁহারা অজ্ঞানকৃতপাপকে পাপ বলেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ পাপে (absolute sin) বিশ্বাস করেন; যাঁহারা জ্ঞানকৃতপাপকেই পাপ বলেন; তাঁহারা বলেন, পাপ আপেক্ষিক অর্থাৎ conditional। এই স্থলেই গুরুতর বিচার উপস্থিত। যাহা নিরপেক্ষ, তাহাই অস্তিত্ববান এবং সর্ব্বদা স্বীয় প্রকৃতিতে অবস্থিত। যাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না তাহাও পাপ, ইহাই যদি হয়, তবে পাপ নিরপেক্ষ, স্বাধীন, অস্তিত্ববান হইয়া উঠে।

ঈশ্বরের স্বরূপই কেবল নিরপেক্ষসত্য, ঈশ্বরই কেবল নিরপেক্ষসত্তা; ইহা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নিরপেক্ষসত্তা নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মই নিরপেক্ষসত্য—তাহা ভিন্ন আর যাহা কিছু,

সকলই আপেক্ষিক। এখানে ধর্ম্ম বলিতে ঈশ্বরের স্বরূপ-অর্থাৎ তাঁহার সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা ইত্যাদি স্বরূপকে লক্ষ্য করিতেছি এবং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার পরম যোগধর্ম্ম, অর্থাৎ বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছি।

এখন পাপ যে আপেক্ষিক, তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথম পাপ বাহিরে নহে—মনে। সাধারণ লোকে বাহির দেখিয়াই পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু পাপ অন্তরেই বিরাজ করে। কেহ রায়বাহাদুর, কিম্বা রাজাবাহাদুর হইবার জন্য অথবা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তাড়নায় লক্ষ টাকা দান করিল, পৃথিবীর লোক তাহাকে ধার্ম্মিক ও দাতা বলিতে লাগিল; কিন্তু যিনি অন্তর্যামী পরমেশ্বর—তিনি দেখিলেন, লোকটী পুণ্যশীল নহেন। আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন দুষ্ট লোক শত্রুকে বিষ পান করাইল। সেই বিষভোজনকারী জ্বরে ভুগিতেছিল। ত্রিদোষক্ষেত্রের জ্বরে, বিকারে সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, হঠাৎ বিষ খাইয়া বাঁচিয়া উঠিল। যে ব্যক্তি বিষ খাইতে দিয়াছিল, তাহার দুরভিসন্ধি লোকে বুঝিল না, চারিদিক হইতে প্রশংসা হইতে লাগিল, "আহা কেমন ধার্ম্মিক লোক! শত্রুকে ঔষধ দিয়া প্রাণদান করিল!" কিন্তু তাহার মনে বেশ জাগিতেছে যে, সে কি উদ্দেশ্যে বিষ খাইতে দিয়াছিল। ঈশ্বরের কাছে সে নরহত্যার পাপেই অভিযুক্ত হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিলে—পাপের মূলে প্রবেশ করিলেই দেখা যায়, অভিসন্ধির অবিশুদ্ধতা, ঈশ্বর ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ এবং স্বীয়প্রকৃতির বিরুদ্ধে জ্ঞাতসারে গমন করাই পাপ।

যখন সেই অসদিচ্ছানুযায়ী বাহিরে কোন কায হয় এবং সেই কায যদি সমাজের অনিষ্টকর হয়, তবেই লোক 'পাপ, পাপ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব এই, ঈশ্বর হইতে যখন যেরূপ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুরূপই আমাদের বিচারশক্তি কর্ম্মক্ষম হয়, অথবা আমরা সেইরূপই করিতে বাধ্য। যদি সে রূপ না চলি, তাহা হইলেই পাপ হয়। অতএব জ্ঞাতসারে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, সেই মহদিচ্ছার প্রতিকূলে চিন্তা করাই পাপ। সুতরাং পাপ, চিন্তার অধীন, ভাবের অধীন এবং কার্য্যের অধীন। এই পাপ কিরূপে নিরপেক্ষ হইতে পারে?

পাপকে যদি কেহ নিরপেক্ষ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন, তবেই অজ্ঞতা পাপ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এই অজ্ঞানতা বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও আপেক্ষিক। শিক্ষার দোষে সমাজের দোষে, জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে লোকে অজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। যখনই জ্ঞানসূর্য্য উদয় হয়, তখনই অজ্ঞানতা চলিয়া যায়। সুতরাং শিক্ষা, সংসর্গ, জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মচিন্তা প্রভৃতি দ্বারাই অজ্ঞানতার হ্রাস এবং ঐ সকলের অভাবে তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং অজ্ঞানতা বলিয়া কোন খাঁটি জিনিস নাই, উহা মৌলিকবস্তু নহে, ধরিবার ছুঁইবার কোন বস্তু নহে।

আর একদিক দিয়া চিন্তা করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পাপবোধের সঙ্গে সঙ্গেই মানব অন্তরে দায়িত্বজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। পাপ আছে অথচ তাহা জানিতে পারিতেছি না, এমন বস্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, যাহাতে আমার আত্মাকে মলিন করিতেছে, অথচ তাহা আমি জানি না; অপর

দিকে সেই বস্তুকে পরিত্যাগ না করিলেও আমার নিস্তার নাই; কিন্তু এ সকল বিষয় ঈশ্বর ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানিতে দিতেছেন না, ইহা তাঁহার স্বরূপের বিরোধী কথা।

আমরা যদি দেহ সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাই, ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বর বেদনা-বোধ দিয়া থাকেন। হাতে ফোড়া হইলে, যন্ত্রনায় অস্থির করিয়া তুলে ডাক্তারের বাড়ী ছুটা ছুটি করি, কত ঔষধ ব্যবহার করি, চিকিৎসা করি। এই বেদনা-বোধ যদি না থাকিত, তবে কি ভয়ানক অবস্থাই ঘটিত। মনে করুন, হাতের এক খানি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিছুই টের পাইতেছিনা, খাই দাই সুখে আছি। ক্রমে ঐ স্থানটী পচিতে আরম্ভ করিল। তথনও কোন উদ্বেগ নাই, বেশ আছি। একদিন আহার করিতে বসিয়াছি, হাত খানি হঠাৎ খসিয়া পড়িয়া গেল! সকলে দেখিয়া অবাক! তখন বুঝিলাম, অনেক দিন হইতে রোগের সঞ্চার হইয়াছিল, আজ তাহার ফল ফলিল। এরূপ হইলে কখনও কি দেহরক্ষা হইতে পারিত? দেহ রক্ষার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে বেদনা-বোধ দিয়াছেন। তেমনি আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য, পাপ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য পাপ-বোধ, দায়িত্বজ্ঞান, পাপের প্রতি ঘৃণা, এবং পুণ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দেন। পাপ করিতেছি, অথচ জানিতেছিনা যে, পাপ হইতেছে, এ বড় ভয়ানক ব্যাপার। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কখনও এই বিধি হইতে পারে না।

বিচারক যখন বিচার করিয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন, তখন তাহাকে বলিয়া দেন যে, "তুমি এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলে, এজন্য তোমাকে দণ্ড দিলাম।" পরমে-

শ্বর কি সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়বান্ বিচারপতি নহেন? তিনি পাপের শাস্তি প্রদান করিবেন, অথচ বলিয়া দিবেন না যে, তোমাকে এই জন্য শাস্তি দিলাম?

মানুষ আর কুকার্য না করে,আর পাপ না করে এই জন্যইত শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা। যদি মানুষ, কি অন্যায় কার্য করিয়াছে তাহা জানিতেই না পারিল, তবে কোন্ বিষয়ে সংশোধিত হইবে? বাস্তবিক মানুষ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে সকল অন্যায় কার্য করে, তজ্জন্য দায়ী নহে, তাহাতে পাপ হয় না, পাপ করিলে পাপী যেমন শাস্তি পায়, তেমন শাস্তি ভোগ হয় না।

অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মে নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। পাপীকে আগুণে দগ্ধ হইতে, জলে ডুবিতে, হাতুড়ীর আঘাত সহ্য করিতে হয় না; কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। সেই শাস্তি আত্মগ্লানি। অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য আত্মগ্লানি ভোগ হয় না। কারণ যেখানে পাপের বোধই নাই, সেখানে আবার আত্মগ্লানি কি? পাপ-বোধ জন্মিলেই আত্মগ্লানির উদয় সম্ভব। তবে এমন হইতে পারে, কেহ মোহে অভিভূত হইয়া যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার জন্য পরিশেষে মনস্তাপ ভোগ করে। তখন জ্ঞান আসিয়াই পূর্ব্ব জীবনের অজ্ঞানকৃত পাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং ঐ পাপের স্মৃতি জাগ্রত হওয়াতেই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থাতে মানুষের জ্ঞানেতেই পাপবোধ জন্মে। তখন অজ্ঞানকৃতপাপ, জ্ঞানকৃত পাপরূপেই গণ্য হয়।

একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। রামচন্দ্র দাস কালীর উপাসক

ছিল। সে অমাবস্যা রজনীতে কালীর কাছে নরবলি দিত। এইরূপে বহুদিন গত হইল। হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের কৃপায় তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইল। তখন সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল যে, এতদিন ধরিয়া সে কি কুকার্য্যই করিয়া আসিতেছিল! তখন সে বুকে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—"হায়, আমি কি ভয়ানক পাপ করিয়াছি! কত যুবককে বলিদান করিয়াছি! হায় হায়! তাহাদের পত্নীগণ এখন বিধবা হইয়া দিবারাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন! কত বালককে বধ করিয়াছি! তাহাদের পিতা মাতা কাঁদিতেছেন! প্রকৃত ঈশ্বরকে ভুলিয়া পাষাণনির্ম্মিত পুতুলকে পূজা করিয়াছি! এ সকল অপরাধের কি আর ক্ষমা আছে? আমি কোথায় যাইব, কি করিব? হে জগদীশ! তুমি আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড কর, আমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান কর।"

পাপীর এইরূপ অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে পাপ-বোধ হইল বলিয়াই অনুতাপের উদয় হইল। এইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় লোকে যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা যদি পরে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইবে। এ ঘটনাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যতক্ষণ না পাপ-বোধ হইবে, ততক্ষণ সেই অন্যায় কার্য্যের জন্য সে দায়ী নহে। পাপ-বোধ হইলেই দায়িত্ব আরম্ভ হইল।

পাপ-বোধ সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি অতি উপাদেয়। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত নরদম্পতী জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করেন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যখনই জ্ঞান আসিল, তখনই হইতে পাপ আরম্ভ হইল এই

কথার অর্থ এই যে, জ্ঞানোদয় না হইলে, প্রজ্ঞা বা বিবেক জাগ্রত না হইলে পাপ বোধ জন্মে না। অজ্ঞান অবস্থায় সত্যা-সত্য, ভাল মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ থাকে না। অজ্ঞানী, আর শিশুর অবস্থা একই। যখনই নরদম্পতী জ্ঞান লাভ করিলেন, তখনই বুঝিলেন 'ছি ছি! নগ্নদেহে আছি!! এরূপে থাকা টা ভাল দেখায় না।'

মানবমনে ধর্ম্মের আদর্শ, ন্যায়ের আদর্শ, প্রকাশিত হয় বলিয়াই অন্যায় ও অধর্ম্মকে সে ভাল বাসে না। আর এই প্রজ্ঞা যতক্ষণ না মনে উদিত হয়, ততক্ষণ মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না; মানুষ পশুর মত কাল যাপন করে। বিবেক যতই উজ্জ্বল হইবে, ততই মানুষ দেবত্বে উপনীত হইবে, —প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর, অজ্ঞানতা, পাপ, মোহ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া মানুষকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্যই জ্ঞানচর্চ্চা, ধর্ম্মপ্রচার, শাস্ত্রপাঠ এবং সর্ব্বোপরি বিবেকের উপদেশ।

পৃথিবীর অজ্ঞানতা ও পাপ বিদূরিত করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে একদিকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির উন্নতি হইতেছে। আর এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদিত হইয়া অন্ধকার মধ্যে সূর্য্যালোকবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক প্রকাশ করিতেছে।

সত্তা-সাধন।

পরমেশ্বর আছেন,—শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যরূপে প্রাণময় মহান্ দেবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এসকল উচ্চতত্ত্ব বলা সহজ; কিন্তু সেই নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যস্বরূপকে অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। নাস্তিকগণ বলিয়া থাকে,—"কোথায় তোমাদের ঈশ্বর? জল স্থল আকাশ দর্শন করিতেছি, শব্দ শ্রবণ করিতেছি, নানাবিধ বস্তু স্পর্শ করিতেছি, ইহার মধ্যে ঈশ্বর বলিয়া কাহাকে ত দেখিতে পাই না? পূর্ব্বাকাশ অনুরঞ্জিত করিয়া উষার নবীনালোক উদ্ভাসিত হইল; প্রকৃতি রজনীরূপ কৃষ্ণ আবরণ উন্মোচন করিয়া হাস্য করিতে লাগিল, ইহার মধ্যে তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন কর, আমরা ত কিছু দেখিতে পাই না; সুনীল আকাশে, কুসুমিত কুঞ্জকাননে, মৃদ্‌কল্লোলময়ী তটিনীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে, অন্য কাহারও হস্ত আছে কি? প্রকৃতি ভিন্ন—প্রকৃতিনিহিত শক্তি ভিন্ন, আর কি আছে?"

আস্তিকগণ এ সকল কথার নানা প্রকার উত্তর দিতেছেন। তর্কের ক্ষুর-ধারে বিপক্ষের মত-জাল কাটিতেছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়ই এক জাতীয়। যে আস্তিক ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন নাই, বাহিরের মতের কথাই যাঁহার একমাত্র সম্বল, তিনি বাক্যে না হইলেও, কার্য্যতঃ নাস্তিক। যিনি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কেবল তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে নাস্তিকের কথা খণ্ডন করেন না, কোনও মত প্রকাশ করেন না। তিনি বলেন, "আমি ঈশ্বরকে

প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতেছি।” যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক কেবল যুক্তি ও প্রমাণের রাজ্যে বাস করেন, ততক্ষণ তাঁহার সত্তা-সাধন আরম্ভ হয় নাই।

পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় পুষ্প বিকশিত হইয়া সুগন্ধে পথিকের মন প্রাণ হরণ করিতেছে। এসময় কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, “ফুলের সুবাস যে বাহির হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি?” তবে সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিবেন,—“আমরা গন্ধ পাইতেছি, ইহাই প্রমাণ।” তেমনি সত্তা-সাধকগণ নীরব ভাষায় যেন সর্ব্বদাই বলিতেছেন,—“হে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসী মানব সন্তানগণ! তোমরা ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছ, অথচ বলিতেছ—ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায়?”

সত্তা-সাধন, মানবের অনন্তজীবন-সম্বল। সত্তা-সাধনদ্বারাই মানব, আধ্যাত্মিক সমুদয় শক্তি লাভ করিয়া থাকে। নাম জপ, প্রার্থনা, যোগ, ধ্যান সত্তা-সাধনের জন্যই এ সকল আয়োজন। সত্তা-সাধনের জন্য পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণ এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাড়ী ঘর স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে গিয়া ধ্যানে মগ্ন হইতেন। ইয়ুরোপ অঞ্চলের মধ্যযুগের তাপসগণ এবং আসিয়া খণ্ডের ঋষি ও দরবেশগণ সকলেই সত্তা-সাধনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনার লক্ষ্য ও উপায়ে যে সকল সময়োচিত অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা পরিহার না করিয়া বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা সাধন আরম্ভ করিবেন, তাঁহারা কখনও সহজে সরল পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন সহজ ও সরল এবং স্বাভাবিক। প্রাচীন

কালের সত্তা সাধন কেবল ধ্যানেতেই আবদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, ধ্যান, কার্য্য উভয় অবস্থাতেই পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ধ্যান ঈশ্বরের এবং কর্ম্ম শয়তানের অথবা শনির, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্ম সকল অবস্থাতেই যোগযুক্ত হইবেন। তাঁহার নিকট ধ্যান ও কর্ম্মের কোন পার্থক্য থাকিবে না। এরূপ সাধনা আরম্ভ হইলে জীবনে কতকগুলি সুলক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়।

প্রথম লক্ষণ—ইহাদ্বারা অন্তরেন্দ্রিয়ের শক্তি বিকশিত হয়। সেই শক্তিবলে সাধক জগৎকে ব্রহ্মময় দর্শন করেন। তিনি যাহা দর্শন করেন, যাহা শ্রবণ করেন, সর্ব্বত্র সকল স্থানেই তাঁহার প্রাণ-সখাকে উপলব্ধি করেন। শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে তাঁহারই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিতে পান। তাঁহার নিকট স্বর্গরাজ্য বলিয়া দ্বিতীয় কোন স্থান নাই, এই সংসারই স্বর্গভূমি, প্রেম-নিকেতন। এখানেই সেই পরম প্রভু, জননী পিতা, সখারূপে বর্ত্তমান। যেমন নীলবর্ণ চশমা চক্ষে দিয়া জগৎ দর্শন করিলে, সকলই নীলবর্ণ দেখায়, তেমনি সাধক যখন ব্রহ্ম-সত্তার ভিতর দিয়া জগৎ দর্শন করেন, তখন পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্র পরিবার, জড়জগৎ এবং অন্তর্জগৎ সকলই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ দেখেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ—আমিত্ববিনাশ। আমিত্ববোধের প্রাবল্য, সাধককে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত আত্মার পরিচয় হইলে আমিত্বের অহঙ্কার থাকে না। তখন সর্ব্বত্র অযাচিত ব্রহ্ম-কৃপা অতি স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। 'আমিত্ব' যে হৃদয়ে প্রবল, সে-হৃদয় পরমেশ্বরের প্রেম দর্শন করিতে পারে না,

সে ব্যক্তি পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করিতে গিয়া নিজের কার্য্যাদি দর্শন করে, ভগবান্‌কে দেখিতে গিয়া নিজকে দেখে, সুতরাং আমিত্বের বাঁধ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কেহ ব্রহ্ম-রাজ্যের সীমাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

তৃতীয় লক্ষণ—যে পরিমাণে সত্তা-সাধন হইবে, সেই পরিমাণে বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইবে। যাঁহার ঘরে সোণা, হীরা, মাণিক প্রচুর পরিমাণে আছে, তিনি কখনও একটী কাণা কড়ির প্রতি লোভী হয়েন না। তদ্রূপ যিনি সেই আনন্দময়, অমৃতময়, শান্তিময় প্রভু পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, এই ক্ষণস্থায়ী অসার সংসারের প্রতি কি তাঁহার আসক্তি থাকিতে পারে? যিনি ঈশ্বরকে পরম ধন বলিয়া না জানিয়াছেন, তিনিই পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবেন এবং ইহার জন্য দিবারাত্র প্রাণপণ করিবেন। যিনি সত্তা-সাধন করেন, তিনিও সংসারধর্ম্মী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের মূলে আসক্তি থাকে না। নিষ্কামভাব হইতেই তাঁহার কর্ম্ম প্রসূত হয়।

চতুর্থ লক্ষণ।—সত্তা-সাধক বিশ্বজনীন প্রেম লাভ করেন। সংসারের প্রেম, স্ত্রী পুত্রে, বন্ধু বান্ধবে, স্বীয় গ্রামে, স্বজাতিতেই আবদ্ধ। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়াছেন, অথবা সত্তা-সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা সকলকেই ভাই ভগিনীরূপে আলিঙ্গন করেন। এমন কি পশু পক্ষিগণও তাঁহাদের আত্মীয়; সজীব বৃক্ষটী ছেদন করিতেও যেন তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা লাগে। বসুধা তাঁহাদের কুটুম্ব। তাঁহারা আঘাত করিতে জানেন না, আঘাত সহ্য করিতে অভ্যস্ত।

নিন্দা করিতে পারেন না, নিন্দকের সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বাণের যন্ত্রণা প্রফুল্ল হৃদয়ে সহ্য করেন। ভ্রমেও পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, পরন্তু পরোপকার করিতে যাইয়া জীবন দিতেও প্রস্তুত।

এই প্রেম, হৃদয়ে উপস্থিত হইলে হৃদয় মধুময় হয়, সংসারের দুঃখ তাপ অন্তর্হিত হয়। বৈশাখের খরতর রবি-কিরণে গ্রাম, প্রান্তর দগ্ধ হইতেছিল, শুষ্ক-কণ্ঠ চাতক এক বিন্দু জলের জন্য চীৎকার করিতেছিল, কৃষক মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া চিন্তাকুল হইয়াছিল, হঠাৎ প্রবলবেগে আকাশ হইতে বারিধারা পতিত হইয়া সর্ব্বস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। সকলের ভয় ভাবনা দূর হইল। প্রকৃতি সংহাররূপিনী মহাভৈরবী মূর্ত্তি পরিহার করিয়া আনন্দময়ী জননীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। ভগবৎ প্রেম হৃদয়ে উপস্থিত হইলে আধ্যাত্মিকজীবনেও এইরূপ আনন্দজনক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আশা, শান্তি, উৎসাহের জ্যোতিতে হৃদয় জ্যোতিষ্মান্ হয়। সেই অন্তর-জ্যোতি মুখেও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

পঞ্চম লক্ষণ।—সত্তাসাধন হইলে সাধক পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ যোগ না হইলে অন্য কোন উপায়েই সাধক পাপের সুদৃঢ় হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। পাপ ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। পরমেশ্বরের সহিত যোগ হইলে, মানব হৃদয়ের প্রতি পাপের কোনই আধিপত্য থাকিতে পারে না। আলোকের আগমনে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি হইলে তৎক্ষণাৎ পাপ পলায়ন করে। সত্তা-সাধন হইলে বাক্যে, ব্যবহারে চিন্তায়, কোন স্থলেই পাপ তিষ্ঠিতে

পারে না। সাধক সত্যস্বরূপের সত্তা অনুভব করিবে, অথচ জীবন পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি থাকিবে, ইহা অসঙ্গতি দোষযুক্ত স্ববিরোধী কথা। সত্তাসাধন হইলে সাধক নিরাপদ ভূমি, অভয়ধাম প্রাপ্ত হন। যতদিন সত্তাসাধন না হয়, ততদিন দুঃখ, কষ্ট, মানসিকবিকার কখন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে না।

ষষ্ঠ লক্ষণ।—সত্তা-সাধকের গুরু বা আচার্য্য স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম। সত্তা সাধক মানব-নির্দ্দিষ্টপথে অন্ধভাবে—গতানুগতিকের ন্যায় পরিচালিত হয়েন না। প্রভু পরমেশ্বর অন্তরে থাকিয়া বিবেক বাণীদ্বারা যে আদেশ করিতেছেন, সেই আদেশ অনুসারে তিনি চলিতে অভ্যস্ত। তাঁহার বিবেক উজ্জ্বল। সেই বিবেকের স্বর্গীয় আলোকে তিনি স্বীয় গন্তব্যপথ অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান। তিনি ঈশ্বরের আদেশে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অন্তরনিহিত ঈশ্বরবাণীই তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র।

ধ্যানে ও কার্য্যে সত্তা-সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে অবতার ও মূর্ত্তি উপাসনায় মানুষের হৃদয় এরূপ সংকীর্ণ, ভ্রান্তিময় হইয়াছে যে, নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপ সাধন করা অনেকের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া উপেক্ষিত হয়। ঋষি-পূজিত ব্রহ্মজ্ঞানকে দূরীভূত করিয়া বহুদেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই এ দেশের এরূপ দুর্গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এখন এই বিষয়ের মৌখিক উত্তর প্রদান না করিয়া ব্রাহ্মদিগকে কার্য্যদ্বারা ইহা প্রদর্শন করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা জীবনদ্বারা ব্রহ্ম-অনুভূতির

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ও জড়বাদ খণ্ডন করিতেছেন। মত, ধর্ম্ম পথে যাইবার সামান্ত অবলম্বন যষ্টিমাত্র, সত্য-সাধন ভিন্ন সাক্ষাৎযোগ ভিন্ন পরিত্রাণ লাভ হয় না, মুক্তি হয় না।

গুরু ও মন্ত্র।

ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন শাস্ত্র। কিন্তু তাহাতে গুরুকরণ ও মন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যায় না। সভ্যতার শৈশব অবস্থায় সরল মানব প্রাণের সরল গীতাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াই ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছে। প্রকৃতিই তাঁহাদের শিক্ষাদাতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিল। প্রকৃতি তাঁহাদের প্রাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নীরব ভাষায় শিক্ষা দান করিত। সে সকল উদাস-সংগীত তাঁহারা অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, প্রচার করিবার জন্যও ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁহারা প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া অনন্ত আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া 'সামগান' করিতেন। ক্রমশঃ যখন আর্য্যগণের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশ হইতে লাগিল, তখন হইতে সমাজে শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। অরণ্যে, পর্ব্বতে, স্রোতস্বতীর সুস্নিগ্ধ পুলিনে, ঋষিগণ আশ্রম স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন পরাবিদ্যা কি, অপরা বিদ্যা কি, ব্রহ্মের স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি এবং কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিলে ধর্ম্মসাধন সহজ হয়, কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় উপদেশ দিতে লাগিলেন। শিষ্য-

গণ আচার্য্যমুখনিঃসৃত বাক্যাবলী ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ সেইরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালের এই শিক্ষাপ্রণালী অতি সফলতা লাভ করিয়াছিল। ঋষিগণের ব্যক্তিগতজীবন, সাধনপ্রণালী এবং ধর্ম্মমত, উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে তদীয় শিষ্যগণ প্রাপ্ত হইলেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, পুস্তক প্রচারিত হইত না; শিষ্য, অনুশিষ্যগণের দ্বারা ঋষি উদ্ভাবিত-ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বসাধারণের নিকট বিদিত ও প্রচারিত হইত। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাপ্রণালীর একটি প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষকের সহিত ছাত্রগণের প্রাণের যোগ স্থাপন হয় না। ছাত্রগণের চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের প্রতি শিক্ষকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ ছাত্রদিগের আধ্যাত্মিকজীবন গঠনের পক্ষেই বিশেষরূপে সাহায্য করিতেন। শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই আচার্য্য শ্রম সফল জ্ঞান করিতেন। ধারাবাহিকরূপে কি প্রণালীতে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত, উপনিষদ্ পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই আছে,—

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। ১
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম॥" ২

বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে

প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। ১।

ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গির্‌কে বলিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে বলিয়াছিলেন; ভারদ্বাজ (সত্যবাহ) পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ হইতে অশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত (অথবা শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সমুদয় বিদ্যার বিষয়ে ব্যাপ্ত) [এই ব্রহ্মবিদ্যা] অঙ্গিরসকে [বলিয়াছিলেন]। ২। *

প্রশ্নোপনিষদের প্রথমে আছে ;—

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে। হরিঃ ওঁ। সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা, শিবি পুত্র সত্যকাম, সৌর্য্য-পুত্র গার্গ্য, অশ্বল-পুত্র কৌশল্য, ভৃগু-পুত্র বৈদর্ভি (বিদর্ভ জাত), কত্য-পুত্র কবন্ধী, ইঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণপর হইয়া "ইনি আমাদিগকে সেই সমস্ত বলিবেন" এই [ভাবিয়া] ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকটে সমাৎ-হস্তে উপস্থিত হইলেন। ১।

ঐ সকল উক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ অতি নিষ্ঠার সহিত আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে দার্শনিক পণ্ডিতগণের এক একটি মণ্ডলী আছে। প্রধান প্রধান দার্শনিক পণ্ডিতগণের শিষ্য প্রশিষ্যাদিগের দ্বারা ঐ সকল মণ্ডলী গঠিত। দার্শনিক

* বাবু সীতানাথ দত্তকর্ত্তৃক প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদ।

আচার্য্যগণ যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন অথবা দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে যাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারাই শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। তাঁহাদিগকে ইংরাজীভাষায় 'কেণ্টিয়ান্' 'হিগেলিয়ান্' ইত্যাদি নামে লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। সেইরূপ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহাদেরও স্কুল ছিল। ঋষিদিগের নামে শিষ্যগণ অভিহিত হইতেন। তবে নবীনে ও প্রাচীনে ভিন্নতা এই যে, প্রাচীনকালের আচার্য্যগণ আধ্যাত্মিক ফললাভের জন্য যেমন চেষ্টা করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে আত্মার সদগতির জন্য সেরূপ চেষ্টা হয় না। প্রশ্নোপনিষদের ২য় শ্লোকে আছে ;—

> তান্‌হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা-
> ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ
> যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ
> সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ ॥

সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বন পূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদয় বলিব। ২।

এই শ্লোকে দুইটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে ; শিষ্যের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি এবং আচার্য্যের বিনয়। ইন্দ্রিয়-সংযম না করিলে, কেহ উপদেশ গ্রহণের অধিকারী হইতে পারে না, আর যিনি উপদেশ দিতেছেন তিনিও অভ্রান্ত নহেন। "যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিকে বলিব।" এরূপ বিনয়ের কথা আচার্য্যগণের মুখে অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়।

* পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতে গুরু শিষ্যের সংবাদ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ের সামাজিক রীতি নীতি ও শাসন প্রণালী ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াই মনুসংহিতা রচিত হইয়াছে। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ নির্ণয়, শিক্ষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ মনুসংহিতায় যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ-পুত্র ৩।৪ বৎসর বয়স হইতে গুরুগৃহে বাস করিবেন। গুরুর আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতে হইবে। শিষ্য,গুরুর ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, গোরক্ষণ, গৃহ পরিষ্কার ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য করিবেন। গুরু শিষ্যকে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিবেন; কিন্তু বিশেষভাবে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, ৩০ বৎসর বয়সে শিষ্য স্বগৃহে প্রতিগমন করিতেন এবং দার পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতেন।

এইরূপে শিষ্যগণ গুরু-গৃহে দীর্ঘকাল বাস করিয়া গুরুর উপদেশে ও গুরু চরিত্রের প্রভাবে ধর্ম্মজীবন লাভে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা গুরু-দেবতার এক একটি প্রতিকৃতিস্বরূপ হইয়া উঠিতেন। গুরুর বিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আচরণ ইত্যাদি শিষ্যগণের হৃদয়ে ফটোগ্রাফের ন্যায় অঙ্কিত হইত। সেই সময়ে শিষ্যগণ গুরুর কিরূপ বাধ্য ও বিনীত ছিলেন, তাহা মহাভারত আদি পর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু, আরুণির বৃত্তান্ত এবং বেদের প্রতি গুরুদেবের কঠোর আদেশ কিরূপে পালিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ সকল দৃষ্টান্তদ্বারা শাস্ত্রকারগণ ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে উপদেষ্টার বাধ্য না হইলে, কখনও শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।

তখন শিষ্যগণ আচার্য্য গৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যায়ন করিলেও ব্রহ্মসাধন এবং ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহারা বৈরাগ্য সাধনার জন্য "শিলোঞ্ছবৃত্তি", "অজগরবৃত্তি" প্রভৃতি অবলম্বন করিতেন। পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা কত ক্লেশই সহ্য করিতেন! ঋষিগণের আশ্রমে নিয়ত ব্রহ্মস্তোত্র ও সামগানে অমৃতধারা বর্ষিত হইত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ সমূহকে পঞ্চমবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,কিন্তু পুরাণ অতীতকালের ঐতিহাসিক উপন্যাস মাত্র। যে সময়ে পুরাণ রচিত হইয়াছে, সে সময়ে পুরাণোল্লিখিত ঘটনা সমূহ ঘটে নাই। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সময়ে পুরাণ লিখিত হইয়াছে। সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্য বৈদিকযুগের ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি উপন্যাসের আকারে প্রচার করাই পুরাণের উদ্দেশ্য। পুরাণ-লিখিত ঘটনা সাময়িক ঘটনা নহে। পরন্তু, মনু তখন আইন করিতেছেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের কিরূপ বাধ্য হইবেন, গুরুর সহিত শিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন,সুতরাং বৈদিক আচার্য্য এবং পুরাণোক্ত আচার্য্যে কিছু ভিন্নতা আছে।

কিন্তু এ বিষয়ে ভগবদ্গীতা সরল পথ অবলম্বন করিয়াছে। গীতা পুরাণশাস্ত্রসমুদ্রের অমূল্য রত্নস্বরূপ। গীতাকার ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ বর্ণন করিয়াছেন, গুরুকরণ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই।

কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, তদুত্তরে গীতাকার কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলিতেছেন ;—

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

গীতা—৪র্থ অধ্যায়।

অর্থাৎ ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই"। কর্ম্ম যোগদ্বারা যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করেন। ৩৮। শ্রদ্ধাবান, তৎপর জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩৯।

গুরুর নিকট গমন কর, মন্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, গীতাকার এ কথা বলেন নাই। "শ্রদ্ধাবান হও, তুমি সেই জ্ঞান হৃদয়ে লাভ করিতে পারিবে।''

পুরাণোক্ত গুরু ছাত্রদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া বহুবৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের চতুষ্পাঠী গুলি প্রাচীন গুরুগৃহের কঙ্কালের ন্যায়। তবে ভিন্নতা এই, তখন ধর্ম্ম সাধন, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মজ্ঞান দান করাই গুরুগণের প্রধান কার্য্য ছিল, এখন কিরূপে প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিতে হয়, কিরূপে পূর্ব্বপক্ষ করিতে হয়, তাহাই অধ্যাপকগণ শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এতক্ষণ বেদ, উপনিষদ্ এবং পুরাণোক্ত উপদেষ্টৃগণের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, এখন তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত উপদেষ্টৃগণের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, প্রথমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে ঈশ্বর জ্ঞান

তৎপর সর্ব্বশক্তির আধাররূপী এক অদ্বিতীয় শক্তিতে বিশ্বাস; উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান; পুরাণে অবতারবাদ, ব্রহ্মজ্ঞান এবং তন্ত্রে সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিকযুগ ভিন্ন, সাকারোপাসনা অন্ত যুগে দেখা যায় না। তন্ত্রের দেবতা যেমন সাকার, তেমনি গুরুর মূর্ত্তিও ভিন্ন। তন্ত্রশাস্ত্র যখন পাঠ করি, তখন আর ঋষিগণের তপোবন, হিমালয়ে তপস্বীগণের নির্জ্জন বন, সাধনাশ্রমের অমৃত নিস্যন্দিনী বেদধ্বনি কিছুই স্মৃতিপথে সমুদিত হয়না। তখন মানস নেত্রে দেখিতে পাই, কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা, পরিধানে রক্তবসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে মহাপাত্রে দ্রবময়ী সুরা—ভীষণ মূর্ত্তি মহাভৈরবীর সাধকগণ মহাশ্মশানে উপবিষ্ট, অথবা কোন গৃহস্থগৃহে শিষ্যের কর্ণে গোপনে মন্ত্র-প্রদানে প্রবৃত্ত।

মন্ত্র কি? বৈদিককালে মন্ত্র বলিলে প্রণব বুঝাইত। তখন প্রত্যেক গুরু বা আচার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বকপোল-কল্পিত অথবা স্বেচ্ছানুরূপ মন্ত্র প্রদান করিতেন না। একই মন্ত্র সকলের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। মন্ত্র গোপনে কর্ণ মূলে প্রদত্ত হইত না, সকলে সমস্বরে উচ্চারণ এবং গান করিতেন। আচার্য্যগণ সেই প্রণব অবলম্বন করিয়া শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। এখন যেমন ব্রাহ্মগণের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র, সকলের উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে, বৈদিক সময়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই ঐরূপ প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। পঞ্জিকা দেখিয়া, ভাল দিন স্থির করিয়া গোপনে শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করা হইত না। চৈতন্ত যেমন কেশব ভারতীর নিকট

দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেরূপ দীক্ষা-প্রণালী বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিলনা। বৈদিক আচার্য্যগণ অমৃতময় উপদেশ-দ্বারা শিষ্যের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। কোন গুরু মন্ত্রের সাহায্যে শিষ্যের পাপ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন না। বৈদিক আচার্য্য বলিতেছেন ;—

"অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬॥
(মুণ্ডকোপনিষদ্ ২য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড)

যেখানে (অর্থাৎ হৃদয়ে) নাড়ী সকল রথ নাভিতে অরার ন্যায় সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে ; সেখানে সেই আত্মা [দর্শক, শ্রোতা, মননকারী এরূপ] বহুরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ওঁ, এইরূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে ; [অবিদ্যা]—অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের স্বস্তি (অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্ন) হউক।"

এখানে আচার্য্য কেবল সাধনের প্রণালী বলিতেছেন, কোন প্রকার অলৌকিকশক্তিপ্রদমন্ত্র বলিতেছেন না।

পরবর্ত্তী শাস্ত্র সমূহের মধ্যেও কোন কোন স্থলে এই প্রণব জপের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় ;—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩
গীতা, ৮ম অধ্যায়।

যিনি ব্রহ্মের আখ্যা ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক পরমাত্মার স্মরণ করেন, তিনি পরমপদপ্রাপ্ত হন।

সুলভশ্চায়মত্যন্তং সুজ্ঞেয়শ্চাপ্তবন্ধুবৎ।
শরীরপদ্মকুহরে সর্ব্বেষামেব ষট্পদঃ।
অনাক্রুষ্টোঽপ্যনাহূতঃ স্বদেহাদেব লভ্যতে।
মনাগেবা হূতোঽপি ক্ষণাত্তবতি সম্মুখঃ

(যোগবাশিষ্ট উপসম পর্ব্ব)।

অর্থাৎ ঈশ্বর, এই শরীররূপ পদ্মে ষট্পদস্বরূপ। তিনি অত্যন্ত সুলভ ও আপ্ত-বন্ধুর স্তায় অত্যন্ত সুজ্ঞেয়। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্ষণ মাত্র আহূত হইলেই তিনি সম্মুখে আবির্ভূত হন।

ততঃ প্রত্যোক্ চেতনাধিগ মোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।

(পাতঞ্জল সমাধিপাদ ২৯ সূত্র)।

অর্থাৎ অনবরত প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন প্রত্যেক চৈতন্যের অধিগম হয় অর্থাৎ আপনার স্বরূপবোধ জন্মে, তৎকালে কোন বিঘ্নই থাকেনা। নির্ব্বিঘ্নে সমাধি লাভ হয়।

এইরূপে প্রাচীন শাস্ত্রকার ও উপদেষ্টৃ গণ সকলেই প্রণবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধভাবে প্রণব উচ্চারণ করিলে কোন ফলোদয় হয় না,—প্রণবের ভিতর দিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা ও ধ্যান করিতে হয়, এ সকল কথা তাঁহারা অতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যোগাচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলী বলিয়াছেন ;—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

(পাঃ দঃ ২৮ সূত্র)।

অর্থাৎ একটি মন্ত্র বা শব্দ উচ্চারণ করা প্রকৃত জপ নহে, মনে মনে তাহার অর্থ চিন্তা করিবার নাম 'প্রকৃত জপ'। প্রণবের অর্থ চিন্তাই আরাধনা। আরাধনার সার নিকর্ষণ করিয়াই মহর্ষিগণ প্রণব রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের মন্ত্র প্রদানের সহিত বৈদিকমন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই।

আর একটা কথা এখানে আলোচ্য। বৈদিক কালে প্রণব, মন্ত্ররূপে অভিহিত হইত না। হিন্দুশাস্ত্র-সমালোচক পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেদের আলোচনায় বলিয়াছেন যে, "এক৪ খানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ।" * * "যজ্ঞের নিমিত্ত বিনিয়োগাদিসহিত মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যাসহিত গদ্য গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ।" যজ্ঞানুষ্ঠান কালে যে সকল বাক্য প্রয়োগ হইত, তাহাকেই মন্ত্র বলে। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, বৈদিক কালের যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং বেদের ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র ভাগের ভাব সম্মিলিত হইয়াই তান্ত্রিক-যুগে মন্ত্র প্রদান এবং প্রতিমার কাছে বলিদানপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সৈকত-তলবাহী স্রোতের ন্যায় সমাজের স্তরে স্তরে যজ্ঞে পশুহনন-প্রথা এবং মন্ত্রোচ্চারণ-প্রণালী অজ্ঞাতভাবে চলিতেছিল। উপনিষদ্ ও পুরাণের সময় তাহা মাথা তুলিতে সমর্থ হয় নাই। তন্ত্রের রাজত্বকালে সেই বৈদিক কালের 'কৃষ্ণবর্ণ' অংশই ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। "গুরু, শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করিলেন," উপনিষদ্ কিম্বা মহাপুরাণ মহাভারতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। তান্ত্রিকগুরুই কর্ণ-মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানেই তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের

কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই মন্ত্র বৈদিকমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তন্ত্রকার সম্পূর্ণ রূপে বেদের অনুসরণ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলেন ;—

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎ পদমুদাহরেৎ।
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
(৩য় উল্লাস ১২ শ্লোক)।

অগ্রে তোমার নিকট মন্ত্রোদ্ধারের কথা বলি, প্রথমে প্রণব কীর্ত্তন করিয়া অনন্তর 'সচ্চিৎ' এই পদ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য ; পরে 'একং' এই পদের পশ্চাতে ব্রহ্মপদ কীর্ত্তন করিলে 'সচ্চিদেকব্রহ্ম' মন্ত্রের উদ্ধার হইবে।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রং ন সিদ্ধ্যতি।
(৩য় উল্লাস ৩০ শ্লোক)।

যে সাধক, মন্ত্রের অর্থ ও তাহার চৈতন্যশক্তি অবগত নহেন, তিনি শত লক্ষ জপ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারেন না।

উপনিষদের সময়ে, বৈদিককালে যেমন প্রণবের ব্যাখ্যা হইত, মহানির্ব্বাণতন্ত্রকারও সেইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যকে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ এবং তদনুসরণ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তৎপর আর একটী বিষয়ে সুন্দর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে যেমন এক একটি সূক্ত এক এক ঋষির প্রণীত—হেডিং এ ছন্দের নাম ও দেবতার নাম লিখিত আছে ; যেমন "মধুচ্ছন্দা ঋষি, অগ্নির্দেবতা" ইত্যাদি ; মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রও ঐ রূপ। যথা ;—

ঋষিঃ সদাশিবো হ্যস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্
দেবতা পরমং ব্রহ্ম সর্বান্তর্যামী নির্গুণম্।

(৩য় উল্লাস ৩৯ শ্লোক)।

এই (অর্থাৎ ওঁ সচ্চিদেকব্রহ্ম) মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা সর্ব্বান্তর্যামী পরব্রহ্ম।

গুরু, মন্ত্র এবং অলৌকিকক্রিয়াসাধন (মিষ্টিসিজ্‌ম) এই তিনের সমাবেশ হইয়াছে তান্ত্রিক যুগে। বৈদিক আচার্য্যগণ শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশদ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহারা অতি সরলভাবে, সমবেত শিষ্য-মণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, 'মিরাকেল্' দেখাইয়া শিষ্যকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেননা। তান্ত্রিক গুরু দিগের পন্থা অন্যরূপ। তাঁহারা শিষ্যের নিকট মন্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ইত্যাদি করেননা, "এই নাম দিতেছি, জপ কর, সমুদয় দেখিতে শুনিতে পাইবে"—এরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু কোন কথা খুলিয়া বলেননা। অপর দিকে শিষ্যের কাছে কোন্ কথা উত্থাপন করিয়া থাকেন? মন্ত্রের গুণে তিনি খড়ম পরিয়া নদী পার হইতে পারেন, দূরস্থ বন্ধুকে ইচ্ছা মাত্র দর্শন করিতে পারেন, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেতিনী প্রভৃতির ক্রিড়া দেখিতে পান। ইচ্ছা করিলেই আকাশ, পাতাল ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন। শিষ্যগণ গুরু-মুখনিঃসৃত এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা শুনিয়া উৎসুকচিত্তে তদনুসরণ করে। যদি মন্ত্র জপে এরূপ ক্ষমতা লাভ হয়, তবে কে না সেই মন্ত্র গ্রহণের জন্য লালায়িত হয়? এরূপে তান্ত্রিকগুরুদিগের পসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকে

বেদ, উপনিষদ্, পুরাণোক্ত ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক-গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইল। গুরু গণ দলে দলে শিষ্য করিতে লাগিলেন।

ততঃ শিষ্যস্য শিরসি ঋষিঃ ন্যাসপুরঃসরম্।
জপেদষ্টশতং মন্ত্রং সাধকস্যেষ্টসিদ্ধয়ে॥
দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানামিতরেষাঞ্চ বামতঃ
সপ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্ত্রং সদ্‌গুরুঃ করুণানিধিঃ।

(৩য় উল্লাস ১৩৪।১৩৫ শ্লোক)।

অনন্তর সাধকের ইষ্টসিদ্ধির জন্য ঋষিন্যাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন। ১৩৪। অনন্তর সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ্ শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে এবং অপর জাতীয় শিষ্যের বাম কর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৩৫।

এরূপে যিনি মন্ত্র প্রদান করেন, সেই গুরু এবং বৈদিকগুরু কি এক জাতীয়? পূর্ব্ববর্ত্তী গুরু গণ আচার্য্য বা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাঁহারা শিষ্যদিগকে সেই উপদেশই প্রদান করিতেন, অন্ধভাবে কোনও মন্ত্র জপ করিতে বলিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ সম্বন্ধে হিন্দু ঋষি বলিতেছেন,—

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥৪॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩য় মুণ্ড, ১ম খণ্ড ৪ শ্লোক)।

যিনি সমুদয় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই

প্রাণস্বরূপ; [তাঁহাকে] যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হয়েননা (অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না)। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হয়েন (অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হয়েন); ইনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

অপরদিকে মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছে ;—

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্রয়ে ॥২৪
কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ রুষ্টা বেতালাশ্চেটকাদয়ঃ।
পিশাচাঃ গুহ্যকাঃ ভূতাঃ ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাঙ্মুখাঃ ॥২৫॥
রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা।
কিং বিভেতি গ্রহাদিভ্যো মার্ত্তণ্ড ইব চাপরঃ ॥২৬॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩য় উল্লাস)।

অর্থাৎ হে দেবশি! দেহী, ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ মাত্রে ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, যিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহার নিকট এই জগতের মধ্যে দুর্ল্লভবস্তু আর কি আছে? গ্রহ, বেতাল, চেটক প্রভৃতি পিশাচগণ, গুহ্যক, ভূত, ডাকিনী গণ ও মাতৃকাগণ রুষ্ট হইয়া তাঁহার কি করিতে পারেন? তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে। যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে সুরক্ষিত ও ব্রহ্মতেজে সমাবৃত,তিনি দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়, সুতরাং তিনি কি গ্রহাদি হইতে ভয় পাইয়া থাকেন?

আর্য্যঋষি শিষ্যকে ব্রহ্মলাভের পথ প্রদর্শন করেন; তন্ত্রের গুরু, শিষ্যকে অলৌকিকশক্তি লাভের আশা-বাণী শ্রবণ করান। এই অলৌকিকশক্তি লাভের জন্যই তান্ত্রিকগুরু, শিষ্যকে মন্ত্র-

পূত কবচ দেন, শিষ্যের শিরোদেশে জপ করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন, এবং শবসাধন ও পঞ্চমকার সাধনের উপদেশ দেন।

তান্ত্রিকগুরু গণ কতকগুলি ভৌতিকশক্তি আয়ত্ত করিয়া বাস্তবিকই হিন্দুসমাজে বিশেষ আধিপত্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যে কেবল বাহুশক্তির বলেই ঐ সকল আশ্চর্য্যক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার দুই একটি নিদর্শন বর্ত্তমান সভ্য জগৎ প্রাপ্ত হইয়াছে। 'মিস্‌মেরিজম্' এবং 'হিবনটিজম্' এ দুইটি কথা অনেকেই অবগত আছেন। নিজের ইচ্ছাশক্তি অন্যের প্রতি অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে ফরাশি দেশে হিবনটিজমের বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। এই শক্তি মানবের এতদূর আয়ত্ত হইয়াছে যে, সংবাদপত্রে তাহার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। একজন বলবান ব্যক্তি দু সের ওজনের কোন দ্রব্য তুলিতে অসমর্থ, আবার একজন বালক পাঁচ মন জিনিস অবলীলাক্রমে তুলিতেছে! কেহ ইচ্ছা করিলেন যে, পাঁচমাস পরে অমুক ব্যক্তি, অমুক স্থানে গিয়া, অমুককে আঘাত করিবে। ঠিক সেই দিনে, সেই ব্যক্তি, ঐ কার্য্য করিবেই করিবে। এই উপায়ে অনেক কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অপর দিকে এই উপায়ে সুরাসক্ত, ব্যভিচারাসক্ত ব্যক্তিদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টাও হইতেছে।

তান্ত্রিকগুরু গণ এইরূপ শক্তি আয়ত্ত করিয়াই লোকদিগকে চমকিত করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের যোগী হরিদাস এবম্বিধ কোনওশক্তিসহই বক্সে ৪০ দিন মাটীর নীচে ছিলেন। ধর্ম্মের সহিত এ কার্য্যের কোনও যোগ নাই, কেন না একবার

তিনি কবর হইতে উঠিয়া অনেক পতিতা রমণীকে লইয়া নির্জ্জনে গমন করেন এবং যখনই লোক জন তাঁহার নিকট যাইত, তখনই টাকা কড়ি চাহিতেন।

তান্ত্রিকগুরুগণ রোগীকে 'ঝাড়িয়া' রোগমুক্ত করেন, এবং তদর্থে মন্ত্রপূত কবচ দেন। এ সকল ব্যাপার হিবনটিজম জাতীয়। যিনি ঐ শক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি যদি রোগীর কাছে বসিয়া মনে মনে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করেন যে, "উহার রোগ সারিয়া যাউক," তবে চিরদিনের জন্য না হউক, কিয়ৎ-কালের জন্য রোগ দূর হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এ সকল কার্য্যকে ধর্ম্মের নামে অভিহিত করা কোনও ক্রমেই উচিত নহে। বিশ্বরাজ্যে তড়িৎ, বজ্র, ভূকম্পন প্রভৃতিতে যে শক্তির বিকাশ দেখিয়া ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করেন, তিনি মিসমেরিজম্ ও হিবনটিজম্ প্রভৃতির মধ্যেও সেই পরমাশক্তির বিকাশ দেখিতে পান; কিন্তু এ সকল ভৌতিকশক্তি যদি ধর্ম্মরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, তবে ধর্ম্মসমাজের বড়ই বিপদ। এ দেশে তান্ত্রিক গুরুদিগের দ্বারা এই বিপদ ঘনীভূত হইয়াছে। লোকে ঈশ্বর লাভের জন্য যত ব্যস্ত, অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য এবং সেই অলৌকিকশক্তি যে গুরু প্রদান করিতে পারেন, তাঁহাকে পাইবার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর ব্যস্ত। গুরু, রূপাকে সোণা করিতে পারেন, জলকে দুধ করিতে পারেন, পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করাইতে পারেন, অতএব গুরুই ব্রহ্ম। এত ক্ষমতা যাঁর, তিনি কি মানুষ? কাজেই গুরু বন্দনা, গুরুস্তোত্র এবং গুরুগীতা প্রস্তুত হইল।

তান্ত্রিক সমাজের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র গ্রহণ না করিলে কেহই ঈশ্বরোপাসনা করিতে অধিকারী হইবেনা। সাধু হও, সচ্চরিত্র হও, জ্ঞানী হও, মন্ত্র গ্রহণ না করিলে, গুরুর পাদপদ্ম জল বিল্বদল দিয়া পূজা না করিলে পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে কেহ সমর্থ নহে!! দীক্ষাই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের সিঁড়ি, দীক্ষা গ্রহণ না কবিলে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের উপায় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তান্ত্রিকগুরু "দীক্ষা-গুরু" এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের গুরুকে "শিক্ষা গুরু" বলা যাইতে পারে। চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিক সমাজের সহিত বহু সংগ্রাম করিয়াও দীক্ষাগ্রহণ এবং কর্ণমন্ত্র প্রদানের নিয়ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেশব ভারতীর নিকট কর্ণ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত না হইলে, চৈতন্য-জীবন যে কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ থাকিত, এরূপ অনুমানের কোনও কারণ নাই। তিনি যেন তান্ত্রিকদেশপ্রচলিত নিয়ম রক্ষার জন্যই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

কেবল হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই গুরু ও মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এরূপ করিবার কারণও আছে। গুরুবাদ, গুরুকরণ, মন্ত্রগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মেই বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে এ সময়ে যাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের গুরু গণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে তান্ত্রিক গুরুদিগেরই পন্থানুসরণ করিতেছেন।

অবতীর্ণ ব্রহ্ম।

গীতাকার বলিতেছেন, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কর্ম্মী দিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য পরমেশ্বর যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তিনি ত্রেতা যুগে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাপী রাক্ষসদিগকে বিনাশ করেন, অপরদিকে ব্রাহ্মণ গণের যজ্ঞকার্য্যের সহায়তা করেন এবং অহল্যার ন্যায় অনেক পাপাত্মাকে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণাবতারে দুষ্কর্ম্মান্বিত কংস এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিনষ্ট করেন, অনেক পাপীকে মুক্তি দান করেন। বামন অবতারে বলিরাজকে পাতালে পাঠাইলেন! এইরূপ হিন্দুপুরাণে গীতোক্ত শ্লোকের সার্থকতাসূচক অনেক আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।

পুরাণোক্ত হিন্দু অবতারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে বাস করেন। লক্ষ্মী তাঁহার পত্নী। সেখানে থাকিয়াই তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল শাসন করেন, সকল খবরাখবর লন। প্রবল পাশবশক্তিকে সংযত রাখিবার জন্য—সর্ব্ব ক্ষমতার সমতার জন্যই তিনি অবতারের বিধান করিয়াছেন; কিন্তু অনেক সময় সেই আইন কানুনে কুলায় না। দুরন্ত অসুর ও রাক্ষসেরা মাথা উচু করিয়া উঠে, নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করে, যজ্ঞকার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়, দেবকন্যাদিগের প্রতি অত্যাচার করে; সেই সকল পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়। তখন ধরিত্রী স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি নারদ ঠাকুরের দ্বারা বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি এইরূপ বলিতে থাকেন,—“হে ঠাকুর, পাপের

ভার আর আমি সহিতে পারি না, শীঘ্র আসিয়া এই দুরন্ত দিগকে বিনাশ কর, আমার ভার লাঘব কর।” কোন কোনও স্থলে দেবতা গণ অসুর ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরূপও লিখিত আছে। যাহা হউক, বিষ্ণু যখন অবতারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন,— কোন শক্তিতে কুলায় না, তিনি স্বয়ং না গেলে আর কার্য্যোদ্ধার হয় না, এরূপ যখন বুঝিলেন, তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কর্ম্মান্বিতদিগকে দমন করিয়া ধর্ম্মস্থাপন করিলেন। কার্য্য সিদ্ধি হইলে তিনি পুনরায় ধরা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

খ্রীষ্টানদিগকেও অবতারবাদী বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে মাত্র একজন "Son of God" আছেন, তিনি যীশুখ্রীষ্ট। লুক-লিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

To him said they all, "Art thou then the Son of God?" And he said unto them, "Ye say that I am."

অর্থাৎ যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল,"তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?" তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা তাহা বলিলে, কেন না আমি সেই বটী।"

যখন যীশু ইহুদীদিগের প্রধান যাজকের নিকট নীত হইলেন, তখন সেই প্রধান পুরোহিত বলিলেন, "আমি তোমাকে দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?" তখন,—

Jesus saith unto him, "Thou hast said: nevertheless I say unto you, here after shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven."

এখানেও যীশু প্রথমতঃ বলিলেন, "তুমিই তাহা বলিলে," তৎপর বলিলেন, "পরন্তু আমি তোমাদিকে বলিতেছি,-ইহার পরে তোমরা মনুষ্য-পুত্রকে প্রভাবের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘে আরূঢ় হইয়া থাকিতে দেখিবে।' '

খ্রীষ্টানধর্ম্মশাস্ত্রে তিন জন ঈশ্বরের কথা লিখিত আছে। পিতা ঈশ্বর—যিনি নিয়ত স্বর্গে রাজত্ব করেন; পুত্র ঈশ্বর—যিনি পৃথিবীর পাপীদিগকে উদ্ধার করেন; পবিত্রাত্মা ঈশ্বর—যিনি মানবহৃদয়ে সাধু-আকাঙ্ক্ষা ও বিবেকরূপে বর্ত্তমান।

পিতা ও পবিত্রাত্মার মূর্ত্তি যীশুখ্রীষ্টের পশ্চাতে স্থাপিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যীশুই তাঁহাদের ঈশ্বর। কেন না, যীশু স্বয়ং বলিয়াছেন, "I am the way" অর্থাৎ "আমিই মুক্তির এক মাত্র পথ।"

এই অবতারবাদের প্রতিকূলে তিন প্রকার উত্তর আছে। প্রথম, দ্বৈত-তত্ত্বের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায়, পরমেশ্বর সেই ব্যক্তিরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন কেন? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক সৃষ্টি করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন না? যিনি ইচ্ছা করিলেই কোটি কোটি সৌরজগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কি রাম, কৃষ্ণ, বামন প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারেন না? তাঁহাকে স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি?

দ্বিতীয়, অদ্বৈত-তত্ত্বের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পরমেশ্বর স্বয়ং চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ-

রূপে অবতীর্ণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি সকলেতেই ব্রহ্মাণু প্রকাশিত। এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই—এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তু ভিন্ন অন্য সত্তা নাই। তিনিই সকল, সকলই তিনি। সকলকে অবলম্বন করিয়া, সকলকে পূর্ণ করিয়া, সকলের স্বতন্ত্র সত্তা বিনাশ করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিরাজিত। যখন এক ভিন্ন দুই নাই, তখন বল, "সকলই অবতার", না হয় বল, "কেহই অবতার নহেন।"

এক ব্রহ্ম ভিন্ন যেখানে অন্য সত্তা নাই, সেখানে রাম তিনি, রাবণও তিনি ; কৃষ্ণ তিনি, কংসও তিনি ; বামন তিনি, বলিও তিনি ; যীশু তিনি, সয়তানও তিনি ; তিনি ধর্ম্ম, তিনি কর্ম্ম ; তিনি পাপ, তিনিই পুণ্য। যেখানে, 'ভেদবুদ্ধি' অজ্ঞানতা বলিয়া অভিহিত, সেখানে অবতারত্ব,—এক জনের বিশেষত্ব থাকিবে কি প্রকারে ? তুমি যে স্বতন্ত্র একটা ঐশীশক্তি আনিয়া দণ্ডায়মান করিতেছ, তাহা তোমার অজ্ঞতার ফল মাত্র। রাম যদি অবতীর্ণ ব্রহ্ম হন, তবে রাবণ কি অবতীর্ণ নহেন ? আর যে তুমি, রাম কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া পূজা করিতেছ, তুমিও কি অবতার নহ ?

তৃতীয়, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী নহেন, খাঁটি অদ্বৈতবাদীও নহেন। তাঁহাদিগের মত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদিগকে "ভেদাভেদবাদী" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর জ্ঞানীদিগের মত অবলম্বন করিলেও অবতারবাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হয়। ইহাদের মতানুযায়ী এইরূপ বলা যাইতে পারে ;—"ঈশ্বর, জগৎ, মানবাত্মা, এই তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু নহে—একই বস্তু—ব্রহ্মবস্তু। জড়ের স্বতন্ত্র

অস্তিত্ব নাই, উহা জ্ঞানাধীন—জ্ঞানেরই বিষয়রূপে প্রকাশিত। মানবাত্মা বলিয়া আমরা যে চৈতন্যপদার্থ অনুভব করিতেছি, তাহাও ব্রহ্মেরই অণু-প্রকাশ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে বটে।

পরমেশ্বর পূর্ণ অনন্ত জ্ঞানময়, মানবাত্মা অপূর্ণ ও সান্ত। এই সকল বিষয়ে মানবাত্মা স্বতন্ত্র; কিন্তু জাতীয়তায় এক। অতএব তোমরা যাঁহাদিগকে অবতার বলিতেছ, তাঁহারা একাধারে মানুষ ও ঈশ্বর দুইই। পৃথিবীর সকল মানুষই তাই। রাম যেমন একাধারে মানব ও ঈশ্বর, রাবণও তেমনি একাধারে রাক্ষস ও ঈশ্বর। তবে রামের সহিত রাবণের পার্থক্য এই যে, রামের মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণ প্রস্ফুটিত, রাবণের মধ্যে রাক্ষসীয়ভাব অধিকতর প্রস্ফুটিত। এই জন্যই রাবণ ঘৃণিত ও রামচন্দ্র সাধুজনবন্দনীয়। আস্তিত্বাংশে রাম ও রাবণ উভয়েই ঈশ্বরীয়শক্তিবিশিষ্ট, গুণাংশে রাম শ্রেষ্ঠ, রাবণ নিকৃষ্ট। কিন্তু রাবণেরও ত দুই ভাব আছে। যদি রামকে অবতার বল, তবে রাবণের মধ্যে যে টুকু ভাল ভাব আছে, সে জন্যও তাহাকে অবতার বলিতে হইবে। তবে সাধুতার তারতম্য অনুসারে কাহাকে বা শ্রেষ্ঠ অবতার, কাহাকে বা ক্ষুদ্র অবতার বলিতে পার।

জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি ঈশ্বরীয়ভাব যাঁহাদের মধ্যে অধিকতর প্রস্ফুটিত, তাঁহারা সাধারণ মানব হইতে যে উচ্চস্থানে অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সাধু বলিয়া—আদর্শ বলিয়া জনসমাজে পূজিত; কিন্তু অবতারবাদিগণ যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া অবতারবাদ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন,

সেই শ্রেণীর অবতার তাঁহারা নহেন। কেননা পৃথিবীতে সহস্র সহস্র সাধু রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেহই অবতার বলেন না।

এতক্ষণ যে সকল মতের আলোচনা করা গেল, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কি দ্বৈতবাদ কি অদ্বৈতবাদ কি ভেদাভেদবাদ কোনও মতেই অবতারবাদ সাব্যস্ত হয় না।

পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই অবতারত্বের অনুকূলে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অবতারের বাস্তবতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেও তাহাতে বিন্দুমাত্র সফলকাম হন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ;—

"প্রথমতঃ তিনি (বঙ্কিম বাবু) কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন, অথচ তাহার ভাল রূপ মীমাংসা করেন নাই। নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কি করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন, বঙ্কিম বাবু তাহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা অসম্ভব। যাঁহারা আপত্তি করেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি ত ইচ্ছা মাত্রেই রাবণ, কুম্ভকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল বধ করিতে

পারেন ; তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল বধ করিবার জন্যই যে ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন, তাহা নহে ; মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অবতার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতারভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন, তবে, তাহাতে মানুষের কোনও শিক্ষা হয় না ; পরন্তু তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন, মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব, তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়।—এই ক্ষণে তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, "ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে কি তিনি আদর্শমনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না,— তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই ? এই খানেই কি তাঁহার শক্তির সীমা ?"—বঙ্কিম বাবু এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।" বাস্তবিক অবতারবাদিগণ এই আপত্তির উত্তর দানে অসমর্থ।

ব্রহ্ম, নিত্য অবতীর্ণ কিরূপে, এখন সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মানবের দুইটী দিক অথবা দুইটী অংশ আছে। এক দিকে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, শান্তি ; অপর দিকে বিষয়-বাসনা, স্বার্থপরতা, পাপাসক্তি, দুঃখ। এমন লোক পৃথিবীতে নাই, যাঁহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দেবভাব নাই এবং বোধ হয় এমন লোক কেহই নাই, যিনি জন্মকাল হইতেই অসদ্ভাববর্জ্জিত, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দোষহীন এবং সম্পূর্ণ পাপহীন হইয়া কেহই জগতে জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু মানবমনের গতি কোন্ দিকে ? সভ্যতার গতি কোন্

দিকে? ঐ দেবভাবের দিকে। কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্ব্বদাই উত্তর দক্ষিণ দিকে থাকে, মানব-হৃদয়ের গতি—আত্মার গতিও তেমনি ব্রহ্ম-কেন্দ্রমুখীন।

মানুষ সুন্দরকে ভালবাসে, কুৎসিতকে ভালবাসেনা; সুগন্ধ গ্রহণ করে, দুর্গন্ধের দিকেও যায় না; পবিত্রতার আদর করে, অপবিত্রতারদিকেও তাকায় না। প্রাণের এরূপ আকাঙ্ক্ষা কেন হইয়াছে? নাস্তিকেরা বলিয়া থাকে, জনসমাজই না কি মানবপ্রাণের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন এই, ঐ সকল মৌলিকগুণ কে সৃষ্টি করে? যাহউক, মানুষ জ্ঞাত, অজ্ঞাতভাবে প্রেম, পবিত্রতা এবং জ্ঞানের জন্য লালায়িত, তাহার গতি সেই দিকে।

প্রতিদিন মানবীয় নীচভাব পরাজিত এবং দেবভাব জয়-যুক্ত হইতেছে। এই দেবভাব আর কিছু নহে, স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের আবির্ভাব।

মাতা, সন্তানকে ভালবাসেন, কেন ভালবাসেন? তাঁহার হৃদয়ে প্রেম আছে বলিয়া। প্রেম কি বস্তু? প্রেম সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই জ্যোতিঃ। এই প্রকার জ্ঞানীর জ্ঞান, সাধুর সাধুতা, কর্ম্মীর কর্ম্মে সেই পূর্ণ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র প্রকাশিত। যেখানে সত্য, জ্ঞান, প্রেম,—সেখানেই সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ।

কিন্তু এই ভাব কোথায় অধিকতর প্রস্ফুটিত দেখা যায়? সাধুর জীবনে, সাধুর কার্য্যে, সাধুর শান্তোজ্জ্বল বদন মণ্ডলে। সাধুর সাধুতা কি? ব্রহ্ম জ্যোতিঃ ভিন্ন সাধুতা আর কিছুই নহে। ব্রহ্মই সাধুর হৃদয়ে সাধুতারূপে অবতীর্ণ; ব্রহ্মই অর্জ্জুন ও নেপোলিয়ানের অস্ত্র-মুখে শক্তিরূপে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও

নিউটনের হৃদয়ে জ্ঞানরূপে অবতীর্ণ, জননীর হৃদয়ে স্নেহরূপে, সম্রাটের মধ্যে পালকরূপে, আচার্য্য-হৃদয়ে শিক্ষাদাতারূপে অবতীর্ণ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর আত্মীয়রূপে, বিবেকরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে অবতীর্ণ।

তিনি মানবহৃদয়ে বিবেকরূপে অবতীর্ণ থাকিয়াই প্রতি-মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের জয়বিধান এবং অসত্যকে বিনাশ করিতেছেন। পরমেশ্বর দ্বাপরে কি ত্রেতাযুগে, বৃন্দাবনে কি যেরুসেলামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাহা নহে। কোনও ব্যক্তি বিশেষে কিম্বা স্থানবিশেষে তিনি আবদ্ধ নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সনাতন। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ মানবজীবনেই সুন্দররূপে দেখা যায়। মানবসমাজে যাঁহারা সাধু, তাঁহাদের জীবনে সেই পবিত্র-স্বরূপের বিকাশ অধিকতর উজ্জ্বল। এজন্যই এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "সাধু হৃদয়ই ঈশ্বরের অধিষ্ঠানভূমি, এবং সাধুবাক্যই শাস্ত্র। কেননা সাধুদিগের দ্বারা ধারাবাহিক রূপে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব সকল রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।"

প্রচলিত অবতারবাদের দূষিতভাব সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং সাধুতারূপে—ভক্তি, প্রেমরূপে—জ্ঞানরূপে—জড়ে চেতনে তাঁহাকে নিত্য অবতীর্ণ দর্শন করিতে হইবে। পরব্রহ্ম, বিশেষ রূপে মানবাত্মায় উজ্জ্বল ও নিত্য অবতীর্ণ, এখানে তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিলে, আর কাহারও অবতারত্বের দূষিত কূপে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।।

পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি? সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, আনন্দ—শান্তি—প্রেমরূপে অধিষ্ঠিত। তিনি আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ এবং মনের মন। মানবাত্মার আধার রূপে—সৃষ্টিরাজ্যে লীলাময় বিধাতারূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করা, তাঁহার সহিত সজ্ঞানযোগ স্থাপন করা এবং তাঁহাকেই একমাত্র ইহ পরকালের উপাস্যদেবতা জানিয়া, তাঁহার প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করা;——তাঁহার পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ অনুভব করা এবং সর্ব্বজীবে প্রেম স্থাপন, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনবাক্য হইতে সত্য গ্রহণ, সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত সাধুদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ।

পৌত্তলিকতা কি? সৃষ্ট কোনও বস্তুকে পরমেশ্বরজ্ঞানে পূজা করা,—কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা অথবা ঈশ্বর জ্ঞানে কোনও মানবের মূর্ত্তিকে চিন্তা করাই পৌত্তলিকতা। এ দেশে পৌত্তলিকতা বলিতে ইহাই বুঝায় যে, শিব কালী, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী মূর্ত্তি এবং অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, বিশেষ বিশেষ প্রস্তর, নদী-সরোবরকে ঈশ্বরবোধে পূজা করা; চতুর্ম্মুখ লোহিত বর্ণ এবং হংসারূঢ় ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ বিষ্ণু এই জগত পালন করিতেছেন, এবং শ্বেতবর্ণ পঞ্চানন, জটা জুট বিভূষিত, ত্রিশূলধারী বৃষবাহন

মহাদেব সংহার করিতেছেন। অতএব এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ঐ দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা অথবা ঐ সকল মূর্ত্তি চিন্তা করা ; কৃষ্ণমূর্ত্তি, চৈতন্যমূর্ত্তি প্রভৃতি পূজা বা চিন্তা করা পৌত্তলিকতা। এই পৌত্তলিকতাতেই এদেশে জাতি-ভেদ, অভ্রান্তশাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুতে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-পুনরুত্থানকারিগণ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে পৌত্তলিকতা সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা পৌত্তলিকতা পুনঃ স্থাপন করিবার জন্য নব নব যুক্তি-মার্গ অবলম্বন করিতেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত হেতুবাদ গুলি আলোচনাযোগ্য।

১। তাঁহারা বলেন "যখন জড়মধ্যস্থিত চৈতন্য ভিন্ন, চেতন-সত্তার ধারণা অসম্ভব—সান্ত ভিন্ন অনন্তের পরিচয় অসম্ভব, তখন সাকারবাদ মিথ্যা হইল কি করিয়া? তোমরা চন্দ্রে, সূর্য্যে, পর্ব্বতে অথবা নিজ শরীর মধ্যে ঈশ্বর-দর্শন করিতেছ, আমরা শালগ্রাম-শীলায় ঈশ্বর দর্শন করি। হিমালয় পর্ব্বতও প্রস্তর, শালগ্রামও প্রস্তর। তোমরা স্বীয় দেহের মধ্যে যখন ঈশ্বর দর্শন কর, তখন তিনি সসীমের মধ্যে বিরাজিত, সুতরাং জড়কে পরিত্যাগ করিয়া—সান্তকে ছাড়িয়া তোমারা ত নিরালম্ব ভাবে ঈশ্বর দর্শন করিতে পারনা, অতএব তোমাদের ও আমাদের মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। আমরা যদি মূর্ত্তি-উপাসক হই, তবে তোমরাও মূর্ত্তি-উপাসক। কিন্তু এই প্রণালীই সত্য।

২। আমরা কাষ্ঠ, মৃত্তিকার ঠাকুরকে পূজা করিনা, তাহার মধ্যে যে প্রাণরূপে চৈতন্যময় পরমেশ্বর আছেন,

তাঁহারই পূজা করিয়া থাকি। তোমরাও চন্দ্র সূর্য্যকে পূজা কর না, তাঁহাদের মধ্যে যে চিন্ময় পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারই পূজা কর। অতএব তোমরা ও আমরা একই পথাবলম্বী।

৩। নিরাকারোপাসক অথচ সাকারবাদ সমর্থনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, মূর্ত্তি-উপাসনার ভিতর দিয়াই এ পর্য্যন্ত সমুদয় ধর্ম্ম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব মূর্ত্তি-উপাসনা বর্জ্জনীয় নহে।

৪। যাহারা ধর্ম্ম—ব্রহ্মতত্ব বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের নাস্তিক হওয়া অপেক্ষা মূর্ত্তি-উপাসক হওয়া কি কল্যাণপ্রদ নহে? উচ্চতর ধর্ম্মে যাহাদের অধিকার নাই, তাহারা মূর্ত্তি পূজা করিবে। এইরূপ অধিকারভেদ স্বাভাবিক।

৫। অন্যান্য দেশের মূর্ত্তি-উপাসনা অপেক্ষা এ দেশের মূর্ত্তি-উপাসনা গভীর জ্ঞানমূলক। এদেশের মূর্ত্তি-উপাসকগণ জড় মূর্ত্তিতে চিন্ময় পরমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে।

৬। 'পৌত্তলিক' বলা হিন্দুর পক্ষে গালি বিশেষ। ইংরাজেরা যাহাকে 'আইডলেট্রী' কহে, এ দেশের দেবোপাসনা সে জাতীয় নহে। এই দেবোপাসনাতে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান,যোগ, ভক্তি আছে। অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পরেও এই দেবোপাসনা করিয়াছেন। কত পণ্ডিত, দার্শনিক, ধর্ম্মপ্রচারক এই দেবতাদিগের চরণে নমস্কার করিতেছেন। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সকলেই দেবতা মানিয়াছেন।

৭। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেই সাকারভাব উদয় হয়। তখন সাধক, ভগবানের লীলাচাতুর্য্য দর্শন করেন।

এ দেশে বৈদান্তিকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সাকারলীলার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সাধনজগতে এই ক্রমবিকাশই স্বাভাবিক।”

এখন প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। জড়ের মধ্যে চৈতন্য আছে বলিয়াই কি আমরা চৈতন্যকে জানিতে পারি অথবা চৈতন্য আছে বলিয়াই জড়কে জানিতে পারি? কোন্ কথাটী সত্য? শেষোক্ত কথাই সত্য। আগে চৈতন্য, তার পরে জড়। জড় বস্তু জ্ঞানাধীন, তাহার আবার নিরপেক্ষ সত্তা কি আছে?*

জড়ে যে ঈশ্বরানুভূতি হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বলা যাইতে পারে না। সৃষ্টবস্তু সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। যেমন কোনও একটী বাড়ী দেখিলে সেই বাড়ীর কর্ত্তাকে মনে হয়, তেমনি সাধক যখন পর্ব্বত, নদ, নদী, বন উপবন দর্শন করেন, তখন তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, অধিপতি দেবতাকে স্মরণ হয়; কিন্তু এই অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে পরোক্ষ।

মানবাত্মা জ্ঞানময় বস্তু, এই চৈতন্য বস্তুর মধ্যেই পরম চৈতন্য পরমেশ্বরকে সাধক প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন সাক্ষাৎযোগের আর অন্য পথ নাই। এই জন্যই হিন্দুঋষিগণ বলিয়াছেন, “যাহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করেন।”

আত্ম-সাগরে নিমগ্ন হইয়াই ঋষিগণ বলিয়াছিলেন, “আমি

---

* ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিমরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে জানিয়াছি ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।”

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, জড়ে ঈশ্বরোপলব্ধি হয় না, আত্মাতেই ঈশ্বরোপলব্ধি হয়। এই আত্মা চৈতন্যবস্তু। তবে কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, একটা জড়ীয় আধার ভিন্ন পরমেশ্বরকে দেখা যায় না।

এখানে আর একটী কথাও মীমাংসিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, পাহাড়, নদী ইত্যাদি দর্শন করিলে স্রষ্টার কথা—বিধাতার কথা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক ; সেইরূপ কালীমূর্ত্তি, দুর্গামূর্ত্তি দেখিলেও তাহাদের স্রষ্টার কথা—অর্থাৎ কুম্ভকারের কথা স্মরণ হইবে। কেননা কুম্ভকারই তাহাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা।

যদি কেহ বলেন, “পর্ব্বতের মধ্যে যেমন চৈতন্যময় ভগবানকে অনুভব কর, তেমনি দেবদেবীর মধ্যে কর না কেন? তাহার উত্তর এই যে, মনুষ্য দেহে যেমন আত্মা বাস করে, সেইরূপ পর্ব্বতরূপদেহে চৈতন্যময় পরমেশ্বর বাস করেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—

“যাঁহারা সকল বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে, ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া ঐ সকল বস্তুর পূজাদি করেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না, যেহেতু ঐ সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন। অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম, তাহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে আছেন স্বীকার করিতে পারেন এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরে ও সকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কহিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন, যেহেতু ঈশ্বর

যিনি অপরিমিত, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, যেমন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তদনুযায়ী হইতে চাহে, এখানে তাহার বিপরীত দেখা যায়, বরঞ্চ উপাসক যে মনুষ্য হয়েন, সে মনুষ্যের বশীভূত ঐ সকল বস্তু হয়েন। ঐ প্রশ্নের উত্তরে এরূপ যদি কহেন যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় অতএব ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয়, ঐ নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, যদি ব্রহ্মকে সর্ব্বময় জানেন, তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না। এস্থলে এমত যদি কহেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে, তাহার উপাসনা করা যায়। তাহার উত্তর এই যে, নূন্যাধিক্য এবং হ্রাস বৃদ্ধিদ্বারা যে পরিমিত হইল, সে ঈশ্বরপদের যোগ্য হইতে পারে না, অতএব ঈশ্বর কোন ও স্থানে অধিক আছেন, কোনও স্থলে অল্প, এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা।*

২। শালগ্রামশীলা, প্রস্তর ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে চিন্ময় অনন্ত পুরুষের উপলব্ধি অসম্ভব। তাহার একটী কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, দ্বিতীয় কারণ এই যে, সীমাবিশিষ্ট জগতের মধ্যে অসীম অনন্তকে আনয়ন করিলে তিনিও সীমাবিশিষ্ট হইয়া যান। এ দেশের সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে, ভূত, প্রেতিনী, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি আসিয়া কোন কোনও লোকের দেহে আবির্ভূত হয়। বোধহয় এই বিশ্বাস হইতেই মূর্ত্তিতে দেবগণের আবির্ভাব অনুমিত হইয়াছে। কুম্ভকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিল, তৎপর ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করিয়া যেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন, অমনি পরমেশ্বর আবির্ভূত হইলেন! তিনি যেন সেখানে ছিলেন না, অন্য স্থানে বাস করিতেছিলেন। যেই পুরোহিত ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র শুনিতে পাইলেন, অমনি তিনি মূর্ত্ত্যাধারে উপনীত হইলেন! আসিলেন কোথায়?

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

খণ্ড মাটির ভিতরে? এরূপ ভাবে যিনি যাতায়াত করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অসীম হইতে পারেন না।

৩। "একদিনে রোম নির্ম্মিত হয় নাই," এক দিনে মানব-সমাজ বর্ত্তমান সভ্যতায় পদার্পণ করে নাই এবং সাধুসম্প্রদায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। যে মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপানে বৃক্ষ কোটরে—মৃত্তিকাগর্ত্তে বাস করিত, আম মাংস ভোজন করিত, উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করিত, সেই মানুষ এখন সুরম্যপ্রাসাদে বাস করে, নানা প্রকার দ্রব্যদ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করে, মনোহর বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়। সেই আদিম মনুষ্য এবং বর্ত্তমান মানুষে কত প্রভেদ!

আধ্যাত্মিকজগতেও এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাই। লোকে যখন আধ্যাত্মিকজীবনের শৈশব অবস্থায় বাস করে, তখন মূর্ত্তি পূজা করে, দেবতার কাছে নরবলি, পশুবলি দেয়; ধর্ম্মের নামে কত কুৎসিত ও জঘন্য কাজ করে। যখন জনসমাজ ধীরে ধীরে জ্ঞানরাজ্যে উপস্থিত হয়, তখন সেই পূর্ব্ব কুসংস্কার, কাল্পনিকধর্ম্মমত ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতে থাকে।

নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে উন্নত ও সভ্য হইতে হইয়াছে, তজ্জন্য কি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সমূহের গুণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে? উলঙ্গ হইয়া বিচরণ, বৃক্ষ-কোটরেবাস এবং আমমাংসভোজন, সভ্যতার অন্তরায়স্বরূপই ছিল। যখন শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই, তখনই মানুষ বাধ্য হইয়া ঐরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিত। ঐ সকল প্রতিকূল ঘটনা

হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখকর অবস্থা লাভের নামই সভ্যতা-অর্জ্জন। আধ্যাত্মিকরাজ্যেও এই নিয়ম; বৃক্ষ-পূজা, মৃত্তিকা-পূজা, প্রকৃত ধর্ম্মের—ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ। এই সকল অন্তরায় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সত্য লাভ করাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন বলা যায়। পৌত্তলিকতা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় নহে, পৌত্তলিকতা বিনষ্ট না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয় না। পুতুল পূজার শেষ পরিণতিও ব্রহ্মজ্ঞান নহে। পুতুল পূজায় যখন অবিশ্বাস জন্মে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। আলোক প্রকাশিত হইলে, যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সূর্য্য উদিত হইলে পৌত্তলিকতা-অন্ধকার দূরে যায়। পৌত্তলিকতা বাস্তবিকই আধ্যাত্মিকরাজ্যে অন্ধকারস্বরূপ, অন্ধকারের আবার মাহাত্ম্য কি? অন্ধকার যেমন অভাবাত্মক, পৌত্তলিকতাও সেইরূপ অভাবাত্মক। পৌত্তলিকতা মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা পরিত্যাগেই সত্যের উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী ত্রিকোণ। বিজ্ঞান আসিয়া বলিল, "পৃথিবী গোলাকার।" পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, আটলান্টিকের অপরদিকে কোনও দেশ নাই, পরে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল সূর্য্য ভ্রমণ করে, পৃথিবী স্থির রহিয়াছে, ক্রমশঃ লোকের এই ভ্রম দূরীভূত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকজগতে এইরূপ নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়া যেমন যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, ধর্ম্ম জগতেও সেইরূপ হইয়াছে। পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, প্রভৃতি মত এখন আর উন্নত সাধক দলে স্থান পাইতেছে না।

৪। এদেশে বহুদিন হইতে দুইটী ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে।

একটী পৌত্তলিকধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম, আর একটী বৌদ্ধধর্ম্ম। পৌত্তলিকহিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা, বৌদ্ধধর্ম্মদ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি ধর্ম্মজীবনলাভ সকল বিষয়েই বৌদ্ধগণ পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পৌত্তলিকধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যে জনসমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, ইতিহাস-পাঠক মাত্রই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

যাহাদের উচ্চতর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে পৌত্তলিকধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, একথা অতি ভয়ানক। একটী পুরাতন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি, পৃথিবী যে গোল এ সত্য অল্পবয়স্ক বালক ধারণা করিতে পারে না। সে দেখে, পৃথিবী চ্যাপটা—থালার মত, অতএব সেই বিশ্বাস অনুযায়ী তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে কি? তাহার সম্বন্ধে কি এইরূপ প্রণালী অব-লম্বন করিতে হইবে যে, বালক এখন পৃথিবী চ্যাপটা বলিয়াই শিক্ষা করুক, যখন সে বড় হইবে, এম্, এ ক্লাশে পড়িবে, তখন পৃথিবী যে গোল তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে। এখন সে গোলত্বের ধারণা করিতে অসমর্থ সুতরাং এখন তাহা শিক্ষা দিবার প্রয়ো-জন কি? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বালকদিগের শিক্ষার সম্বন্ধে কোন অভিভাবক, কোন শিক্ষকই এইরূপ উপায় অব-লম্বন করেন না। যাহা সত্য, তাহা যুবককে যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, বালককেও তেমনি শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল বুঝাইবার প্রণালী ভিন্ন। বালককে অতি সরল ভাষায়—সরলভাবে বুঝা-ইতে হয়, যুবককে বৈজ্ঞানিকপ্রমাণাদিদ্বারা শিক্ষা দিতে হয়। আহার্য্য সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, তবে ভিন্নতা এই, শিশু

দুগ্ধ পান করে, যুবকগণ ডাল রুটি খায়। তেমনি সত্যস্বরূপ নিরাকার পরমেশ্বর সকলেরই উপাস্য। ধর্ম্ম-শিশুগণ সহজ ভাবে তাঁহার নিরাকারসত্তা ধারণা করিবে, শিক্ষিত ও উন্নত ব্যক্তিগণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধারণা করিবেন।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, আকাশের একটা সীমা আছে। সাধারণ লোকের এই ভ্রম দেখাইয়া তাহাদিগকে আকাশের অনন্তত্ব সরলভাবে বুঝাইলে কি তাহারা ধারণা করিতে পারেনা? আকাশ এবং কাল যে অনন্ত, এ কথা গ্রাম্য নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে। তেমনি যে ব্রহ্মজ্ঞান মহর্ষিগণ লাভ করিতে পারেন, সামান্য লোকেও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। কতকগুলি লোক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে, আর কতকগুলি লোক (যাহারা পণ্ডিত নহে, অথবা তাদৃশ জ্ঞানী নহে) মূর্ত্তি-উপাসনা করিবে, এরূপ একটা সীমা নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। সত্য সকলেরই অবলম্বনীয়, মিথ্যা সকলের পক্ষেই পরিবর্জ্জনীয়।

যে দেশের ঋষিগণ, তপস্বিগণ, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা-তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে জগতে আবিষ্কার করিয়াছেন; জগতের সভ্যতার সূর্য্যোদয়কালে যাঁহারা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন; আত্মা ও পরমাত্মার যোগই যে দেশের সাধনা, আজ সে দেশের লোকে বলিতেছে "নিরাকারের ধ্যান হয় না, উপাসন হয় না, তাঁহাকে দেখা যায় না," এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই।

এখন অধিকারভেদ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিয়া এ প্রশ্নের উত্তর শেষ করিব। আমরাও এক প্রকার অধিকারভেদ

স্বীকার করিয়া থাকি, তাহা এই ;—যিনি যেমন শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত টুক অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি 'ক, খ' শিখিতেছে, সে উচ্চ সাহিত্য-তত্ত্ব কি বুঝিবে ? বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ যিনি পড়েন নাই, তিনি বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব কি জানিবেন ? অপরদিকে পাপবিকারে যাহার মন অভিভূত, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া উদ্দীপিত হইবে ? এবম্বিধ যোগ্যতা অনুসারে স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক। যিনি যেমন উপযুক্ত, যেমন ধারণক্ষম, তিনি তেমনি বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারেন, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এদেশীয় অধিকারভেদ এরূপ নহে। এই অধিকারভেদ গুণগত, অবস্থা-গত, শক্তিগত নহে ; এদেশের জন্মান্তরবাদের সহিত, জাতি-ভেদের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। এই অধিকারভেদেই নানা উপাস্যদেবতা সৃষ্টি করে।

একমাত্র নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম সকলেরই উপাস্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার সকলেরই সমান। অবশ্য ক্ষমতা অনুসারে কেহ অল্প কেহ অধিক লাভ করিতেছেন। ধ্যানপরায়ণ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, আর একজন সামান্য ব্রাহ্ম এক নহেন। মহর্ষি উন্নত রাজ্যে বাস করেন, অনেকেই সেই উচ্চ স্থানে বাস করেন না। কিন্তু লক্ষ্য ও উপাস্যদেবতা সম্বন্ধে সকলেরই একতা আছে ; সাধন ও মত সম্বন্ধে একতা আছে ; প্রভেদ কেবল যোগ্যতাতে। মহর্ষি যেমন সাধন ভজন করিতেছেন, অন্যে তেমনি পারেন না। না পারিবারই কথা। সকলের শক্তি, যোগ্যতা একরূপ নহে। দশজন ছাত্র স্কুলে এক শ্রেণীতে

পড়ে, সকলেই এক পুস্তক পড়িয়া থাকে; কিন্তু কেহ পড়া শুনায় অধিকতর অগ্রসর হয়, কেহ সর্ব্ব নিম্নে থাকে, কেন? যোগ্যতাই তাহার কারণ। তেমনি শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট সাধকের লক্ষ্য বিষয়ে একতা থাকিলেও যোগ্যতার তারতম্য হেতু উন্নতি অবনতি দেখিতে পাওয়া যায়।

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। সূর্য্যালোক, বায়ু, জল ইত্যাদি জীবনধারণের জন্য সকলেরই প্রয়োজনীয়। এ সকল ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে কেহ পারে না। রাজা বল, প্রজা বল, ধনী বল, নির্ধন বল, পণ্ডিত বল, মূর্খ বল, সকলেই প্রকৃতির নিকট একই ভাবে এই সকল বিষয়ের জন্য অধীন হইয়া বাস করিতেছে। তবে যিনি ধনী, তিনি সুপরিষ্কৃত জল পান করেন, সুনির্ম্মল বায়ু যেখানে বহে, সেখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, সকল বিষয়েই স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সমূহ পালন করেন। গরীবেরা সেরূপ পারে না। তাহারা অর্থাভাবে আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে বাস করে, অপরিষ্কৃত জল পান করে। ধর্ম্ম জগতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়াযায়। দুর্ব্বলাধিকারিগণ ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, সবল ব্যক্তিগণ পাপ প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া, স্বার্থপরতাকে পদাঘাত করিয়া মহাবীরের ন্যায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? মুক্তি লাভ করা। মুক্তি কাহাকে বলে? মুক্তির দুই প্রকার অর্থ আছে। এক অর্থ পাপ, তাপ, মোহ হইতে বিমুক্ত হওয়া, আর এক অর্থ পরমেশ্বরকে লাভ করা।

উচ্চতর হিন্দু শাস্ত্রে, ইহা স্পষ্টরূপ স্বীকৃত হইয়াছে যে, এক-

মাত্র নিরাকার পূর্ণব্রহ্মের উপাসনাতেই মুক্তি লাভ হয়, নতুবা হয় না। এই নিরাকার পরব্রহ্মেরস্বরূপপ্রতিপাদক তিনটী প্রণব হিন্দুশাস্ত্রে উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে। উপনিষদ্ শাস্ত্রে "ওঁ ব্রহ্ম," গীতাতে "ওঁ তৎসৎ," এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "ওঁ সচ্চিদেকব্রহ্ম।" অর্থাৎ সকল মানবেরই সাধনার বিষয়, ব্রহ্ম-লাভ, উক্ত প্রণব মন্ত্র জপ করা ব্রহ্ম লাভের পন্থা, অতএব এই পথে গমন করাই শ্রেয়। যেমন দিল্লী যাইতে হইলে পূর্ব্বাঞ্চল-বাসীদের পশ্চিম দিকে গমন করিতে হয়; যিনি রেলে যাইবেন, তিনি সকলের আগে, জলযানে যিনি যাইবেন, তিনি কিছু পরে, নৌকাতে কিম্বা পদব্রজে যিনি যাইবেন, তিনি সকলের শেষে যাইবেন; এ সকল অর্থ সামর্থ্যের কথা, যোগ্যতার কথা; কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। ইহার মধ্যে যদি একদল লোক এমন থাকেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যও দিল্লী গমন; কিন্তু তাঁহারা পশ্চিম দিকে গমন না করিয়া, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তবে তাঁহারা কখনও, কোন কালেও গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তেমনি একমাত্র নিরাকার পূর্ণব্রহ্মকে লাভ করাই যখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তখন সেই দিকে না গিয়া, প্রতিমাপূজা,—জড় বস্তুর পূজা করিলে ঈশ্বর হইতে বিপরীতপথে, অসত্যের পথেই চিরকাল থাকিতে হইবে। ব্রহ্মের উপাসনা ভিন্ন অন্য কোনও উপা-সনাতেই মুক্তিলাভ হয় না। কেবল যে মুক্তিলাভ হয় না, তাহা নহে, মনুষ্যকে চিরজীবন অন্ধকারে থাকিতে হয়।

মূর্ত্তি-পূজা; জড় বস্তুর পূজা অসত্য-পূজা। অসত্যের সেবা করিয়া কেহ সত্যস্বরূপকে লাভ করিতে পারে না। চিরদিন

মিথ্যা কথা বলিয়া কি কেহ সত্য কথা বলিতে শিখে? বালকেরা যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন কি আমরা বলি যে "এখন উহাদিগকে মিথ্যা বলিতে দাও, উহারা অবোধ, সত্যাসত্য বুঝে না, যখন বয়স হইবে, তখন সত্য বলিবে।" এরূপ শিক্ষা দান করিলে আরও সর্ব্বনাশ। শিশুকাল হইতেই সত্য কথা বলিতে, অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য অভ্যাস করাইতে হয়। ইহাই শিক্ষার সার্ব্বভৌমিকনিয়ম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে মূলসূত্র অনুসারে লোকে দৈনিক ব্যাপার সমূহ সম্পন্ন করিতেছে, তাহা ধর্ম্মবিষয়ে প্রয়োগ করিতে চাহে না।

ব্রহ্মলাভ ভিন্ন যখন উপায় নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মই যখন একমাত্র ধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তখন এই পথে সকল মানব সন্তানকেই আসিতে হইবে। ব্রহ্মোপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল যে আমরাই শ্রেষ্ঠ বলিতেছি, তাহা নহে, এদেশের সাধকগণও উচ্চৈঃস্বরে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে তৃতীয় উল্লাসে লিখিত আছে; "যাঁহার কর্ণকুহরে ব্রহ্মমন্ত্ররূপ মহামণি স্থান পাইয়াছে, তিনিই ধন্য, কৃতি ও ধার্ম্মিক, তিনি সর্ব্বতীর্থেস্নাত ও সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন; অধিক কি, তাঁহাকে সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। * * তাঁহার মাতা পিতা ধন্য হন, কুল পবিত্র হয়, পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দভোগ করতঃ এই গাথা গান করিতে থাকেন, "আমাদের বংশোৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছেন। আমাদের নিমিত্ত গয়া বা তীর্থক্ষেত্রে পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন কি? যখন আমাদের কুলে সৎপুত্র

প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তখন আমাদের অন্য দানু, জপ, হোম বা অন্যান্য সাধনারই বা প্রয়োজন কি?”

এই ব্রহ্মসাধনার অধিকারী কে নহেন, সকলেরই অধিকার আছে। জ্ঞান, প্রেম বৃদ্ধি করিয়া পবিত্র হইতে, হৃদয়ের মধ্যে সেই পরম দেবতার সাক্ষাৎ পাইতে সকলেরই অধিকার আছে। এদেশে হিন্দুসমাজেই কেবল অধিকারভেদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানগণ কি হিন্দু অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে অধিকতর অগ্রসর? তাহা নহে। কিন্তু মুসলমানগণ সকলেই ত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। মুসলমান সমাজের বাল, বৃদ্ধ সকলেই ঈশ্বর বলিতে, খোদা বা আল্লা বলিতে, কোন বস্তু মনে করে না। মুসলমান কৃষক নিরাকারের পূজা করিতেছে, আর হিন্দু ভট্টাচার্য্য এবং বি, এ, এম, এ, পাশ ছাত্র নিরাকারের ধারণা করিতে অক্ষম! ইহা কি লজ্জার কথা নহে?

যদি দেখিতাম, হিন্দুসমাজে যাঁহারা বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বান্বেষী, তাঁহারাই নিরাকারের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা হইলে অধিকারভেদের যুক্তির একটা কারণ পাওয়া যাইত। কিন্তু যখন দেখিতেছি, হিন্দুসমাজে সকলেই মূর্ত্তি-উপাসক; সন্ন্যাসীদিগের ঝুলিতেও শালগ্রাম থাকে, যোগীরাও ঠাকুর বাড়ীতে প্রণাম করেন, কালী, দুর্গা, পূজা করেন, তখন আর কি করিয়া বলিব যে, জ্ঞানলাভ হইলে মূর্ত্তি-উপাসনা চলিয়া যায়, নিরাকারের উপাসনা প্রস্ফুটিত হয়? পৃথিবীর ধর্ম্মের ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করি, তবে দেখিতে পাই, অতি নিরক্ষর কৃষকের মধ্যেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নিরাকার পর-

ব্রহ্মের সত্তা অতি সাধারণ লোকের প্রাণেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সেই মহাশক্তি প্রাণে লাভ করিয়া জগতকে কম্পিত করিয়াছেন। যীশু লেখাপড়া জানিতেন না, ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই, পাণ্ডিতদিগের সংসর্গে বাস করেন নাই। তিনি কি নিরাকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন না? তদীয় শিষ্যগণ অনেকেই জালজীবী ছিলেন, তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের ভাব কি করিয়া লাভ করিলেন? ইহুদিজাতি চিরকাল নিরাকারের উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। মহম্মদ লেখা পড়া জানিতেন না, তিনি স্বীয় প্রাণে নিরাকার ব্রহ্মের দর্শনলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্ম-বাণী শুনিয়াছেন। যীশু, মহম্মদ লেখা পড়া না জানিয়া পৃথিবীতে কি এক মহাযুগ আনয়ন করেন নাই? পৃথিবীতে কি আশ্চর্য্য বিপ্লব সাধন করিয়া যান নাই? আজ যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের নামে কোটি কোটি লোক উন্মত্ত হইতেছে, যে খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রভাবে নূতন সভ্যতা বিস্তৃত হইতেছে, ইহা কি সেই দুইজন নিরক্ষর লোক হইতে উদ্ভব হয় নাই? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি অবিশ্বাসী নাস্তিকের ন্যায় বলিব যে, নিরাকার ব্রহ্মের পূজায় সাধারণের অধিকার নাই?

বিদেশ ছাড়িয়া একবার স্বদেশের কথা ভাবি। নানক, নিরাকারবাদী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে মুদির দোকানে কাজ করিতেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার কিছুই প্রাধান্য ছিল না। জোলাকুলে-পালিত কবীর কি ছিলেন? বিদ্যাতে তাঁহার অধিকার ছিল না। অধিক দিনের কথা নহে। ছত্রিশগড়ে ঘাসীদাস নামক একজন মুচীজাতীয় নিরক্ষর লোক ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরূপ এক ধর্ম্ম প্রচার করেন।

সেই ধর্ম্মের নাম সত্যধর্ম্ম। তাঁহাদের উপাস্যদেবতা নিরাকার পরমেশ্বর। সে ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, অভ্রান্তশাস্ত্র নাই। বঙ্গদেশের বলরাম হাড়ীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। এ ব্যক্তি গ্রাম্য চৌকিদার ছিলেন। পরে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। * এসকল দেখিয়া শুনিয়া কি বিশ্বাস করিব, সাধারণ লোকে নিরাকারের উপাসনা করিতে অসমর্থ?

বাস্তবিক, কি যুক্তি কি ইতিহাস, কি লোক-চরিত্র, যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক, অধিকারিভেদ কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা উন্নতির প্রতিরোধক; ইহাতে মানুষের আশা, উৎসাহকে খর্ব্ব করে, মানুষকে আত্ম-তৃপ্তির কূপে নিক্ষেপ করে, মানুষ চিরকাল ছোট হইয়া বাস করে।

৫। এদেশের মূর্ত্তি-উপাসকদিগের মধ্যে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়? তবে তাঁহাদের মুখে যে জ্ঞানের কথা শুনিতে পাওয়াযায়, তাহার অন্য কারণ আছে। অন্যান্য দেশের পৌত্তলিকতা, মানবের আদিম অনভিজ্ঞতাপ্রসূত, এদেশের পৌত্তলিকতাও অজ্ঞানতামূলক বটে; কিন্তু বৈদান্তিকগণের ব্রহ্মবাদের ছাপ এই পৌত্তলিকতার উপরে পতিত হওয়াতে, কখন কখন পৌত্তলিকতার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার এই সকল উন্নত ধর্ম্ম-মতের স্থূল স্থূল আভাস কৃষকদিগের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। একবার লেখক একজন সামান্য মাঝির সহিত পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন, সেই মাঝি বলিল, "মহাশয়, পাপই

* লেখক-প্রণীত "চরিত-রত্নাবলী" ও "চরিত-মুক্তাবলী" দ্রষ্টব্য।

বা কে করে, পুণ্যই বা কে করে? সকলই তিনি করান।" "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদেস্থিতেন" এই শ্লোকটী তাহার বংশের কেহ বোধহয় শোনে নাই, অথচ সৈকত-ভনবাহী স্রোতের ন্যায় এই অদ্বৈতমত কেমন আশ্চর্য্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে।

উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, বহুল পরিমাণে এদেশের লোকে অবগত আছে। সেই সকল কথা—এবং পৌত্তলিকতার বৈজ্ঞানিকব্যাখ্যা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়াযায়। ইহা দেখিয়া কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, "এদেশের মূর্ত্তি-পূজা জ্ঞানমূলক?"

কেহ কেহ বলেন, "আমরা কাষ্ঠও মৃত্তিকা পূজা করিনা, তন্মধ্যস্থিত নিরাকার দেবতাকেই পূজা করিয়া থাকি।" এসকল কথার কোনই মূল্য নাই। ইহা তাঁহাদের মুখের কথা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্তিকে পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা না করিলে, মূর্ত্তি-পূজা এতদিনে উঠিয়া যাইত।

পরমেশ্বর এক ভিন্ন দুই নহেন। পৌত্তলিকধর্ম্মে পরমেশ্বরকে বহু করা হয়। ঋগ্বেদের সময় মাত্র ৩৩টী দেবতা ছিল, এখন তেত্রিশকোটি হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা রোজ রোজই বাড়িতেছে। রোজ রোজই দু একটী দেবতা সৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বরকে মূর্ত্তিরূপে চিন্তা করিলে, তাঁহাকে দেশ কালে আবদ্ধ করা হয়; তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকে না। অতএব যে পৌত্তলিকতায় এক পরমেশ্বরকে বহু বলিয়া বর্ণন করে, অখণ্ডকে খণ্ড, অনন্তকে সান্ত এবং সর্ব্বজ্ঞকে দেশকালে আবদ্ধ করে, তাহা কি "জ্ঞানমূলক?"

৬। ইংরাজেরা যাহাকে "আইডলেট্রী" বলে, এদেশের

পৌত্তলিকতা বাস্তবিক সেই জাতীয়। এই পৌত্তলিকতা এদেশের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে, এদেশের ব্রহ্মজ্ঞানকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে, এমন কি এই পৌত্তলিকতাদ্বারা এদেশের জাতীয়চরিত্র দূষিত হইয়াছে।

উপাসক, উপাস্যের অনুকরণ করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। উপাস্যদেবতা যদি নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক হন, তবে সাধকও নির্ম্মলচিত্ত হইবেন। উপাস্য, যদি দুষ্ক্রিয়াসক্ত হন, তবে সাধকও নীচত্ব প্রাপ্ত হইবেন। একটী সুন্দর কথা প্রচলিত আছে যে, "কেহই আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়া অধিক মহত্ব লাভ করিতে পারেন না।"

স্বীয় স্বীয় উপাস্য দেবতাদিগের চরিত্র অনুকরণ করিতে গিয়া এদেশের নরনারিগণ কত ভয়ানক কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাদেব, গাঁজা ধুতুরা এবং ভাঙ্গ খান, এজন্য শিবোপাসকগণ অনেকেই ঐ সকল নেশা করিয়া থাকে। তন্ত্রোক্ত দেবতা মদ্যপান, মাংসভোজন ও অন্যান্য কুক্রিয়াতে সন্তুষ্ট হন, এ জন্য বীরাচারী তান্ত্রিকেরা কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বদাই আমরা দেখিতেছি। মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোককে শাসন করিলে তাহারা এই বলিয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থন করে যে, "দেবতাগণও মিথ্যা কথা বলে, প্রবঞ্চনা করে, সুরাপান করে, আমরা ত মানুষ।"

পশুবলির ত কথাই নাই, দেবতার কাছে নরবলি দিবারও বিধি আছে। ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের রাজত্ব না হইলে বোধহয় ভারতবর্ষে এখনও নরবলি প্রচলিত থাকিত। বাঙ্গালা দেশের

ন্যায়ে এই অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের আত্মা কি কলুষিত হয় না ?

প্রশ্ন হইতে পারে, "এদেশে যাঁহারা মূর্ত্তি-উপাসক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কি দেবোপম লোক অভ্যুদিত হন নাই ? দৃষ্টান্তস্বরূপ রামপ্রসাদ,তুকারাম প্রভৃতির কথা উল্লেখিত হইতে পারে।" এই শ্রেণীর সাধক ভিতরে সম্পূর্ণ বৈদান্তিক এবং বাহিরে কিয়ৎ পরিমাণে পৌত্তলিক ছিলেন। দেবোপাসনার সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে ইঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। যখন ইঁহারা পৌত্তলিকতাকে অসার ও মিথ্যা জানিয়া এক চিন্ময় পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনই ইঁহাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহারা পৌত্তলিকগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু পরিশেষে পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাসবিহীন হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন।

মূর্ত্তি-উপাসকের মূর্ত্তি-উপাসনায় অবিশ্বাস এবং অপরদিকে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপে বিশ্বাস হইলেই মুক্তি লাভ হয়। পৌত্তলিকতাতে কখনও মুক্তি লাভ হয়না। যে পৌত্তলিকতাতে মানব-মনকে দূষিত করে, আত্মাকে প্রকৃত পথ হইতে দূরে লইয়া যায়, সেই পৌত্তলিকতাতে মুক্তি লাভ হয়, ইহা স্ববিরোধী কথা।

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা নাকি প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত। ভক্তিভাবে ডাকিলেই তাঁহারা স্বমূর্ত্তিতে সাধকের নিকট প্রকাশিত হন। বাস্তবিক দেব-দর্শন কি একবারেই স্বকপোলকল্পিত কথা ? ইহা

কি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা? তাহা নহে, ইহার মূলে একটু সত্য আছে, সেই সত্য এই ;—সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়া যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন, অনেক সময় তাহা তিনি দর্শন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

এইরূপ কথিত আছে যে, উপাস্যদেবতার মূর্ত্তি নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করিবার প্রয়াসী হইয়া একজন সাধক তাঁহার গুরুর নিকটে উপায় জানিতে চাহিলেন। গুরু বলিলেন, "তুমি সপ্তাহ কাল গৃহ-দ্বাররুদ্ধ করিয়া মহিষের মস্তক চিন্তা করিবে। এই এক সপ্তাহ কাল আসন হইতে উঠিবেনা, অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবেনা।"

শিষ্য, গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া মহিষের মুখ, দুইটী শৃঙ্গ, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি গভীর রূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থায় তাঁহার মন হইতে অন্য চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইল। এমন কি তিনি সংসারকে বিস্মৃত হইয়া মহিষের মস্তক দর্শনে তন্ময় হইলেন। সপ্তাহ পরে গুরু পুনরায় উপস্থিত হইলেন এবং শিষ্যের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মহিষমুখ-ধ্যাননিবিষ্ট শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব, আমি বাহিরে যাইব কি করিয়া?" গুরু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" শিষ্য বলিলেন, "আমার মস্তক যে শৃঙ্গের মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ শিষ্য এমন তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট শৃঙ্গ-যুক্ত মহিষ-মস্তক প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। তিনি মহিষমস্তকের সহিত এমন ভাবে যুক্ত হইয়াছেন যে, তিনি দেখিতেছেন, যেন মহিষশৃঙ্গের মধ্যস্থলে তাঁহার নিজের মস্তকটী রহিয়াছে।

গুরু বলিলেন, "তোমার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, তুমি তন্ময়তা লাভ করিয়াছ।"

কেবল সাধকগণ এরূপ তন্ময়তা লাভ করেন, তাহা নহে; যিনি গভীর ভাবে কোনও বিষয় চিন্তা করিবেন, তিনিই এই অবস্থা লাভ করিবেন। একজন ডাক্তারের একটী কুকুর ছিল। কুকুরটীকে তিনি অত্যন্ত-ভাল বাসিতেন। হঠাৎ সেই কুকুরটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ডাক্তার সর্ব্বদা তাহাকে চিন্তা করিতেন। তিনি চিন্তার প্রগাঢ় অবস্থায় কুকুরটীকে জীবন্ত দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন রোগীর গৃহে যাইতেন, তখন দেখিতেন, তাঁহার গাড়ীর অগ্রে অগ্রে কুকুরটী যাইতেছে। আহার করিবার সময় দেখিতেন, যেন কুকুরটী টেবিলের নীচে বসিয়া রহিয়াছে!

এইরূপ আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কাহারও স্ত্রী-বিয়োগ হয়। পত্নী তাঁহার প্রাণস্বরূপা ছিলেন। অকস্মাৎ সেই পত্নী পরলোক গমন করাতে স্বামী ভয়ানক শোক প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। অন্য কোনও বিষয়েই তাঁহার মন বসিতনা, সর্ব্বদাই স্ত্রীকে চিন্তা করিতেন। শয়নে, ভ্রমণে, আহারে, উপবেশনে তদীয় পত্নী চিন্তারূপিণী হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার পত্নী-চিন্তা গভীরতা প্রাপ্ত হইল, তখন বাহিরেও স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন! যখন তিনি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করেন, তখন দেখেন, প্রিয়তমাপত্নী অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। কখন বা শয়ন-মন্দিরে, কখন বা ভোজন-গৃহে দেখিতে লাগিলেন।

মূর্ত্তি-উপাসকেরও এইরূপ অবস্থা হয়। তিনি যখন তাঁহার উপাস্য-দেবতার ধ্যানে তন্ময় হন, তখন সেই দেবতার মূর্ত্তি বাহিরেও দেখিতে পান। অন্তরে কোন মূর্ত্তি-ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, বাহিরেও সেই মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই জন্ত যিনি কালীর ধ্যান করেন, তিনি কখন কখন কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি হনুমানের ধ্যান করেন, তিনি চক্ষু মুদিলে অথবা বাহিরে হনুমানমূর্ত্তি দেখিতে পান। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-ধ্যানে এরূপ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি নীলাচলে অবস্থিতি কালীন বৃক্ষদিগকে কৃষ্ণ ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতেন। তিনি সকল স্থানেই সেই নবঘনশ্যাম কৃষ্ণমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেন। চক্ষু মুদিলে কৃষ্ণ, মেলিলেও কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করিতেন।

একজন খ্রীষ্টান মহিলা সর্ব্বদা যীশুর ক্রুশের বিষয় চিন্তা করিতেন। সেই চিন্তার প্রগাঢ় অবস্থায় প্রথমতঃ তিনি ক্রুশ দেখিতে পাইলেন, তৎপর এমনি হইল যে, ক্রুশ-হত যীশুর ন্যায় তাঁহার শরীর কাটিয়া রক্তবাহির হইতে লাগিল। একাগ্রমনে চিন্তা করিলে তাহার ফল এতদূর হইতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে? ইহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশেষ।

মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে এবং গাঁজা, মদ, অহিফেন ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন করিলে স্বীয় স্বীয় মনোকল্পিত প্রতিমূর্ত্তি সমূহ উজ্জলভাবে লোকে দেখিতে পায়। এদেশের প্রাণায়াম যোগীগণও নানাবিধ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রণায়াম যোগ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রাণায়ামের লক্ষণ এই, "রেচক-পূরক কুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণ নিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ" ইহার ভাবার্থ এই, দেবতার নাম বা কোনও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নাসিকার এক ছিদ্র অঙ্গুলী-দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্রদ্বারা নিশ্বাস বায়ুর আকর্ষণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ুরোধ, পরে অপর ছিদ্রদ্বারা বায়ু-বিসর্জ্জন এবং একারম্ভেই ইহার বিপরীত দ্বারদ্বারা ঐরূপ পূরক, কুম্ভক, রেচক ইত্যাদি করণ। অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বায়ু গ্রহণ করা, বিসর্জ্জন করা এবং রোধ করাকেই প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়ামকালে বায়ু গ্রহণকে পূরক বলে, গৃহিত বায়ুকে যথা সময়ে ত্যাগ না করিয়া কিছুকাল রক্ষা করাকে কুম্ভক বলে, তৎপর সেই সঞ্চিত বায়ুকে পরিত্যাগ করিবার নাম রেচক। আমরা স্বাভাবিক নিয়মে যে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি, ঐ বায়ু স্বাভাবিকনিয়মে যে সময় টুকও অন্তরে রাখিবার কথা, কুম্ভকযোগদ্বারা প্রাণায়ামকারিগণ তার চেয়ে অনেকক্ষণ বেশী রাখেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র বলিতেছে, সহজবায়ু (ভূ-বায়ু) অপেক্ষা প্রশ্বাসবায়ুতে অধিক কার্ব্বনিকএসিড গ্যাস থাকে। এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, ভূ-বায়ুতে যে পরিমাণে কার্ব্বনিকএসিড গ্যাস থাকে, অস্বাভাবিক উপায়ে তদপেক্ষা অধিক কার্ব্বনিক এসিড অন্তরে ধারণ করিলে কি ক্ষতি হয়? কেন না প্রাণায়াম-কারিগণ কুম্ভকযোগদ্বারা দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে কার্ব্বনিকএসিড গ্যাস ধারণ করিয়া থাকেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ভূ-বায়ুতে

যে পরিমাণে থাকা প্রয়োজন, যদি তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বেশী থাকে, তবে ঐ বায়ু বিষাক্ত হয়। প্রাণা-য়ামকারিগণ যে বায়ু রোধ করিয়া রাখেন, তাহা ঐ বিষাক্ত-বায়ু। ঐ বিষাক্ত বায়ুর নাম নারকটিক্ বিষ।

এই নারকটিক্ বিষের গুণ ভয়ানক। গাঁজা, অহিফেন, ধুতুরা সেবন করিলে যে রূপ ক্রিয়া হয়, নারকটিক্ বিষেও সেই রূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ গাঁজা, অহিফেন ইত্যাদি সেবনে যেমন নেশা হয়, নারকটিক্ বিষ শরীর মধ্যে তেমনি মাদকতা উৎপন্ন করে। এই জন্যই বোধ হয়, প্রাণায়ামকারিগণ কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, অথবা চীৎকার করেন এবং নানাবিধ কাল্পনিকমূর্ত্তি দর্শন করেন। অহিফেনসেবিগণ যে মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করেন, তাহা অনেক সময় জীবন্তরূপে সম্মুখে দেখিতে পান। ইহা উক্ত নারকটিক্ বিষেরই ফল।

৭। সাধক, পরমেশ্বরের চিন্ময়স্বরূপ প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়া বাহ্যজগতে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন সেই অন্তর-বাসী পরম দেবতাকে প্রকৃতির মধ্যে লীলাময়রূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। বাহিরে ব্রহ্মানুভূতিকেই লীলা দর্শন বলে। বৈষ্ণব-গণ যে লীলা দর্শনের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা সাকার-মূর্ত্তিমূলক। রাধা কৃষ্ণ তাঁহাদের উপাস্য, তাঁহারা ঐ ঐ মূর্ত্তি পূজা করেন। চৈতন্যের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলে, তাহা সকলেরই অব-লম্বনীয় হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈষ্ণবগণ সাকারভাবে ঐ সকল তত্ত্ব সাধন করিতে গিয়া প্রকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণের অবতারবাদ ও সাকারবাদ, "ব্রহ্মজ্ঞান

প্রাপ্তির পরে লীলা দর্শন" নহে। তাহার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কি সম্বন্ধ আছে?

ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ও জাতীয়ভাব।

মানবজীবনের দুইটী দিক আছে, একটী আধ্যাত্মিক, অপর-দিকে আনুষ্ঠানিক দিক বলা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক দিকের নাম "ধর্ম্মজীবন", আনুষ্ঠানিক দিকের নাম "সামাজিকজীবন" বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিক কি? ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক এবং উপাসনার আবশ্যকতায় বিশ্বাস। অপর দিকে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়;—

১। সাধন-প্রণালী।

২। সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীভাব।

৩। বিবাহ।

৪। দায়াধিকার।

৫। গার্হস্থ্যজীবন।

৬। মাতৃভাষা।

৭। ধর্ম্মপ্রচার।

ক্রমে এই সকল কথা আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মের কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই ব্রাহ্মের পরিচালক। জ্ঞানই তাঁহার কর্ণধার। জ্ঞানের আদেশ—বিবেকের আদেশ ভিন্ন ব্রাহ্ম কোন্ কার্য্যই করিতে পারেন

না। কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হইলে ব্রাহ্ম, প্রার্থনাশীল অন্তরে স্বীয় জ্ঞানের নিকটেই জিজ্ঞাসু হইবেন। তিনি সেখান হইতে যে উত্তর পাইবেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বিধি। কি ধর্ম্মতত্ত্ব কি সামাজিকপ্রশ্ন সকলই জ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। একমাত্র প্রজ্ঞাই ব্রাহ্মের অন্ধকার পথের আলোক-বর্ত্তিকা।

ঈশ্বর, আত্মা, পরকালে বিশ্বাস এবং উপাসনার আবশ্যকতা এ সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত। এই সকল মত সার্ব্বভৌমিক। ইহার কোনও একটীতে অবিশ্বাসী হইলে তিনি সত্যধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে পরমেশ্বরের সাতটী স্বরূপ সাধন হইতেছে। তন্মধ্যে চারিটী দার্শনিক এবং তিনটী নৈতিক। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং অখণ্ড, এই চারিটী দার্শনিক এবং আনন্দ, প্রেম ও পুণ্য এই তিনটী নৈতিকস্বরূপ। এই সকল স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন। যে সকল মত এই সমুদয় স্বরূপের প্রতিকূল, তাহা পরিত্যাগ না করিয়া কেহ ব্রাহ্ম থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ—পরমেশ্বর জ্ঞানময়, সৎপুরুষ, তিনি অজ্ঞানতা, অবিদ্যাদ্বারা কখনও অভিভূত হইতে পারেন না। জ্ঞান ও অজ্ঞানতা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। যাঁহারা বলেন,—"পরমেশ্বরের দুইটী দিক; এক পূর্ণ জ্ঞানের দিক, অপরটী অবিদ্যার দিক।" তাঁহাদের কথার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও যোগ নাই।

তিনি অনন্ত—দেশে কালে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন

সুতরাং অবতারবাদ, সাকারবাদ—যাহাতে ঈশ্বরকে দেশে কালে আবদ্ধ করে,—ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে।

তিনি অখণ্ড—বহু নহেন। সুতরাং বহু-দেববাদ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে স্থান পাইতে পারে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলিতেছে,—"সমুদয় শক্তি একই পরমাশক্তির বিকাশ মাত্র।"

তিনি আনন্দস্বরূপ—স্ত্রী পুত্র, পরিবার সংসার দুঃখের হেতু নহে; সংসার মায়ার খেলা, বিকার নহে, বিষের ভাণ্ড নহে। সকলই আনন্দময় বিধাতার লীলা।

তিনি প্রেমস্বরূপ—মানবসন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হই-বেনা, অনন্ত নরকেও থাকিবে না। ব্রহ্মকৃপায় সকলেই পরি-ত্রাণের পথে গমন করিতেছে।

তিনি পবিত্র—সংসারে পুণ্যেরই জয় হইতেছে। পাপ পরাজিত হইতেছে। তিনি পাপীর দণ্ডদাতা এবং পুণ্যবানের পুরস্কার দাতা। আত্মগ্লানিই পাপের শাস্তি, ব্রহ্মানন্দ উপভো-গই পুণ্যের পুরস্কার। স্বর্গও নরক বলিয়া কোনও সুন্দর অথবা কুৎসিত স্থান নাই।

ঈশ্বরের স্বরূপ যেমন বিশ্বজনীনসত্য, মানবাত্মাও তেমনি। মানবাত্মা সচ্চিদানন্দময়; কিন্তু অপূর্ণ, অনন্ত উন্নতিশীল এবং ঈশ্বরের সহিত সহিত নিত্যযুক্ত। যদি কেহ বলেন, "পরলোক নাই. ইহজীবন ধ্বংশের সহিত আত্মারও ধ্বংশ হইবে," তবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সীমা—সত্যের সীমা অতিক্রম করিলেন।

যিনি পরমেশ্বরকে মানেন—এক জন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা আছেন বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সুশীতল ছায়া হইতে বহু

দূরে অবস্থিত। মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, উপাসনার ভিত দিয়াই মানবাত্মা এই উন্নতিপথে অগ্রসর হইবে। উপাসনা দ্বারাই পরমেশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং আত্মা জ্ঞান প্রেম পুণ্যে সঞ্জীবিত হইয়া মোক্ষপথে গমন করে। যিনি এই মহাতত্ত্ব অস্বীকার করেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত এই সকল মূল মতে সকল ব্রাহ্মকেই এক হইতে হইবে।

কেহ কেহ জাতীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকে যে, "যিনি হিন্দু, তিনি উপনিষদোক্ত—বেদান্ত প্রতিপাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, যিনি মুসলমান তিনি সুফীধ গ্রহণ করিবেন, যিনি খ্রীষ্টান তিনি পুরাতন বাইবেলোক্ত একে শ্বরবাদ গ্রহণ করিবেন," ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহা করিতে হইবে সকলই জাতীয়ভাবে, দেশীয়ভাবে।

প্রত্যেক জাতির প্রাচীন শাস্ত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে একে শ্বরের কথা বর্ণিত আছে। নানারূপে একেশ্বরের ভাব বিভি শাস্ত্রের মধ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু কোনও স্থানেই পূর্ণত প্রাপ্ত হয় নাই। এদেশে পরব্রহ্মের উপাসনা এবং তাঁহার স্বরূ ঋষিদিগে হৃদয়ে অতি সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; কি তাহাও পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। অতএব কোনও দেশী প্রাচীন একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলে তাহা নবশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিধান হইবে না, কতকগুলি মৃত মত ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। বিশে ষতঃ সেই সকল জটিল মত গ্রহণ করিলে অনেক বিপদে আশঙ্কাও আছে।

আংশিকসত্য সকল শাস্ত্রে—সকল ধর্ম্মেই আছে। ব্রা যদি তাহার কোনও একটী অবলম্বন করেন, তবে ধর্ম্মও সংকী

এবং অসম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং ব্রাহ্ম, জ্ঞান-বিচারে যাহা সুসংগত বলিয়া অনুভব করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিবেন। সত্যের মধ্যে কোনও জাতিভেদ নাই; তাহা ইয়ুরোপেই থাকুক বা ভারতেই থাকুক, ব্রাহ্ম সকল দেশীয় সত্যকেই গ্রহণ করিবেন। সাম্প্রদায়িকভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে খর্ব্ব করে।

জাতীয়তার কথা স্মরণ হইলে প্রথমে সাধন-প্রণালীর কথা মনে উদয় হয়। যিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশ-প্রচলিত সাধন-প্রণালী যদি তাঁহার জ্ঞানানুমোদিত হয়, তবে তিনি গ্রহণ করিবেনই। কিন্তু ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, উপাস্যের স্বরূপের সহিত সাধন-প্রণালীর নিগূঢ়যোগ রহিয়াছে। যে ঈশ্বর স্বহস্তে অসুর নিপাত করেন, তিনি নরবলিতে প্রীত হইবেন বৈ কি? যে ঈশ্বর গঞ্জিকা ও সুরাপান করেন; তাঁহার সেবক তাঁহাকে নিশ্চয় ঐ সকল দ্রব্য দিয়া পূজা করিবেন; যে ঈশ্বর বলেন, "হে মানব! তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমার এই প্রিয় পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলাম," সেই প্রেরিতকে না মানিলে, সেই ঈশ্বরের পূজা হয় না; যে ঈশ্বর রণক্ষেত্রে ভক্তকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করান, সেই চতুর্ভুজস্বরূপে না ভাবিলে সেই ঈশ্বরের পূজা হয় না; যে ঈশ্বর বলেন, "আমি রাম, আমি কৃষ্ণ"; সেই ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে রাম কৃষ্ণেরই পূজা করিতে হইবে। ব্রাহ্মের ঈশ্বর সাকার নহেন, সুতরাং তাঁহার পূজাও সাকার নহে। ব্রহ্মের পূজোপকরণ ছাগল-ছানা—মহিষ—জবা বিল্বদল, নহে। তাঁহার পূজার উপকরণ জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি হৃদয়েরবস্তু, কিন্তু এই জ্ঞান ভক্তি উপার্জ্জন করিতে হইলে বিশেষ সাধনের প্রয়োজন।

চিন্তা, মনন, ধ্যান, নিধিধ্যাসন, সমাধি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় সাধন-প্রণালী। এই প্রণালী যদি ব্রহ্মলাভের অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে ইহা সকল দেশীয় ব্রাহ্মদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইয়ুরোপীয়গণ চেয়ারে বসিয়া, দাঁড়াইয়া, জানু-পাতিয়া প্রার্থনা করেন, ইহাই তাঁহাদের জাতীয়ভাব। কিন্তু তাঁহাদের কি ধ্যানের প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি ভারতীয় সাধকদিগের মত সাধন করিতে হইবে না? নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। ধ্যান করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।

অপর দিকে প্রার্থনা এবং নর-সেবা ইয়ুরোপ অঞ্চলে, খ্রীষ্টান জগতে বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এদেশীয় ব্রাহ্মগণ সেই ভাব আয়ত্ত করিবেন। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা সকল ব্রাহ্মকেই করিতে হইবে এবং জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম এই তিনের সামঞ্জস্যও সকলের জীবনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ইহার মধ্যে জাতীয়তার রেখাপাত কোথায় হইতে পারে?

নামজপ, কীর্ত্তন, নিরামিষভোজন ইত্যাদিও এদেশের সাধন-প্রণালী। এদেশের ব্রাহ্মগণ ইহার কোন কোনটী গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এ সকল প্রণালী যদি সাধন ভজনের অনুকূলই হয়, তবে সকল দেশীয় লোকেরই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সংকীর্ত্তন ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সাহেবব্রাহ্ম, মুসলমানব্রাহ্ম, কাফ্রিব্রাহ্ম সকলেরই খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে। "জাতীয়ভাব" বলিয়া কেহ বাদ দিতে কেহ বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যে

সকল উপায় অবলম্বন করিলে মানব-হৃদয় ঈশ্বরমুখীন হয়, তাহা সকল দেশের, সকল জাতীয় লোকেরই অবলম্বনীয়।

পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যে আধ্যাত্মিক অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার নামই উপাসনা। উপনিষদে "দ্বাসুপর্ণা সযুজা" এবং "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি মহাবাক্যে এই গভীরতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাব ধর্ম্মের প্রাণ, ইহা না হইলে ধর্ম্ম হয় না; কিন্তু এই মহাভাব যে "আমাদের জাতীয়ভাব" বলিয়া কেবল আমরা—হিন্দু ব্রাহ্মগণই সাধন করিব, তাহা নহে; পৃথিবীর যেখানে, যে কোনও দেশে যে কোনও ব্রাহ্ম আছেন, সকলকেই এই সম্বন্ধ অনুভব করিতে হইবে। এই ভাব সাধন না করিলে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম সাধন করা হয় না, সুতরাং এটী বিশ্বজনীনসত্য। ব্রহ্ম, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা। এই মহাতত্ত্ব প্রথমে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু ইহা পৃথিবীর সাধকমণ্ডলীর সাধারণসম্পত্তি।

সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী—যাহার যত টুকু ক্ষমতা আছে; তাহাকে ততটুকু অধিকার দেওয়াই সাম্যনীতির অর্থ। এ দেশে সেই সুবিধা নাই। প্রকৃত সাম্যবাদ এ দেশে অপ্রচলিত। ভারতীয় বর্ণগত জাতিভেদ প্রথা সাম্যনীতির ভয়ানক শত্রু। এই মহা শত্রুর করাল গ্রাস হইতে এ দেশকে উদ্ধার করা ব্রাহ্মসমাজের এক প্রধান কার্য্য। বৈদিকগুণ, বংশগত গুণ এবং জাতীয়তা প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে এই ভাব ব্রাহ্মসমাজে স্বীয় মায়ার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। একজন সাধু বলিয়াছিলেন, "পাপ যখন পাপমূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়,

তখন কোনই চিন্তা থাকে না, কেননা পাপকে তখন পাপ বলিয়া চিনিতে পারাযায়; কিন্তু সে যখন প্রীতিকর পরমাত্মীয়রূপে—'রামের নিকট বিভীষণের উপস্থিতির ন্যায়'—উপস্থিত হয়, তখনি সাধক ভয়ানক বিপদে পতিত হন। আজ কাল জাতীয়তার আকারে যখন ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ উপস্থিত হইতেছে, তখন বড়ই বিপদের কথা। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব প্রকার জাতিভেদ বিনাশ করিবার জন্য সমর ঘোষণা করিয়াছেন, যে কোনও দেশের লোক হউন, এই সমর দলের পতাকা সকলকেই ধারণ করিতে হইবে।

অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অভ্রান্তগুরুর চরণে, কেহবা মধ্যবর্ত্তীর চরণে, কেহবা অভ্রান্ত শাস্ত্রের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিতেছে। এইরূপে যেখানেই স্বাধীনতা বিক্রিত হইতেছে, সেখানেই মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির স্রোত বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গুরু, শাস্ত্র এবং মধ্যবর্ত্তিতার বাঁধে উন্নতিশীল মানব জীবনের গতি রোধ হইয়া যাইতেছে। অতএব সকল দেশীয়, সকল জাতীয় ব্রাহ্মকেই এই প্রাচীর ভগ্ন করিতে হইবে।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা আবশ্যক যে, এ দেশের সাধন-প্রণালীর একটী বিশেষ দোষ এই, যিনি সবল তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন; কিন্তু যিনি দুর্ব্বল তিনি সাকারোপাসনা, অবতার-উপাসনা, গুরু-ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। এইরূপ অধিকারভেদ যে সত্যের বিরোধী—এবং মানবাত্মার স্বাধীনতার বিরোধী তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহা সত্য, তাহা সবল দুর্ব্বল সকলেরই জন্য। অপর দিকে মধ্যবর্ত্তিতা, অভ্রান্ত

শাস্ত্র, অভ্রান্তগুরুরূপ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, প্রকৃত সত্য দর্শন করিবার ক্ষমতা থাকে না।

স্বাধীনতা অর্থ, স্ব-অধীনতা। স্বীয় প্রকৃতির অধীন হইলেই মানুষ স্বাধীন হয়। স্বেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতা নহে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলাই প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ। এই স্বাধীনতা যাঁহার নাই, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই স্বাধীনতা সকল দেশীয়, সকল জাতীয় ব্রাহ্মকেই রক্ষা করিতে হইবে।

এখন মৈত্রি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এই, এই পৃথিবী ব্রহ্মের প্রেমপরিবার। বর্ত্তমান সময়ে নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোকের মধ্যে প্রেমের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। যে কোনও দেশবাসী হউন, তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মসাধনে—আহার ব্যবহারে—আদান প্রদানে—সমুদয় সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা এক হইয়া যাইব। ভিন্ন দেশবাসী বলিয়া আমরা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ভিন্নরুচিসম্পন্ন নিশ্চয়ই থাকিব; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যদি হিন্দু-জাতিভেদের ন্যায় একটা বৈষম্য স্থাপন করা হয়, তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত হইবে না।

বাঙ্গালীব্রাহ্ম, পঞ্জাবীব্রাহ্ম, মুসলমানব্রাহ্ম, ইয়ুনিটেরিয়ান্‌-ব্রাহ্ম সকলে এক ভূমিতে দণ্ডায়মান—এক প্রেমের বন্ধনে সংবদ্ধ—এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি জাগ্রত হইবে না। সুদূর সুইডেন্‌বাসী পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম হেমারগ্রেণ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মের কেমন প্রীতিভাজন ছিলেন! তাঁহার ন্যায় দূরদেশস্থ ব্রাহ্মের সহিত সামাজিক অনুষ্ঠান-সূত্রে আমরা কি একীভূত হইতে পারিব না?

জগতের গতি সম্মিলনের দিকে। সমগ্র পৃথিবীতে পরস্পর চিন্তা ও কার্য্যের বিনিময় হইতেছে। রাজনীতি, বাণিজ্য এবং ধর্ম্মের উদারভাবদ্বারা মানবসমাজ এরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা,—বৈষম্যের শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। 'জাতীয়ভাব,' 'দেশীয়ভাব' বলিয়া পূর্ব্বে যাহা অতি যত্নে রক্ষিত হইত, তাহা এখন মিলনের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকার ধর্ম্মমহাসভা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। অতএব এই উন্নতির যুগে, জাতিভেদ, দেশভেদ, শাস্ত্রভেদ প্রভৃতির কণ্টক রোপণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের গতিরোধ করা মহাপাপ।

কেহ কেহ বলেন, "কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গালী-হৃদয় ভক্তিপ্রধান, সুতরাং শ্রবণ, কীর্ত্তন ইঁহাদের জাতীয়ভাব। বাণিজ্যজীবী ইয়ুরোপীয়গণ কর্ম্মপরায়ণ, সুতরাং নর সেবা তাঁহাদের জাতীয়ভাব। যাযাবর কোরেস জাতীয় মুসলমানগণ উৎসাহের অগ্নিস্বরূপ—উৎসাহই তাঁহাদের জাতীয়ভাব। হিমালয় কন্দরে সমাসীন, প্রকৃতির রম্যকাননবাসী প্রাচীন সাধুগণ শান্তরসাস্পদ স্থানে বাস করিয়া শান্ত সমাহিত হইয়াছিলেন, শান্তিই তাঁহাদের জাতীয়ভাব ছিল। দেশীয় জল, বায়ু, শারীরিক গঠন ইত্যাদির সহিত এই সকল ভাবের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিলে জাতীয়ত্ব—সঙ্গে সঙ্গে মানবত্ব বিনষ্ট হইবে। অতএব একীভূত হইবার আশা কোথায়?"

উপরিউক্ত ভাবগুলি প্রত্যেক জাতি এক একটী প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু সেই জীবনই আদর্শজীবন, যে জীবনে ভক্তি, নর-সেবা, ব্রহ্মজ্ঞান, উৎসাহ প্রভৃতি সমুদয় ভাবের বিকাশ

হইয়াছে। প্রাচীন জাতি সমূহের এক একটী বিশেষ বিশেষ ভাব আছে সত্য বটে; কিন্তু কেবল সেই বিশেষভাব সাধন করিয়া সেই জাতীয় লোকেরা প্রকৃতজীবন লাভ করিতে পারে না। অপর জাতীয় বিশেষত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি বাণিজ্য সম্বন্ধে যে পৃথিবীর সকল দেশীয় লোকের সহিত পরস্পর বিনিময় চলিতেছে, তাহা কি মঙ্গল-জনক নহে?

জগতে যে সকল জাতি আছে, তন্মধ্যে মুসলমান জাতিই একাকারের—এক পরিবার গঠনের—একীভূতের পক্ষপাতী। মুসলমান, স্বীয় ধর্ম্মে সকলকে এক করিয়াছে। প্রাচীন কোনও ধর্ম্মেই এরূপ সাম্যবাদ প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দেশীয়ভাব—জাতীয়ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অপর মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত আহারে ব্যবহারে—চাল চলনে—আদান প্রদানে এক পরিবারের ন্যায় হইতে হয়। এই জন্যই অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতা অতি-দৃঢ়। যাঁহারা বলেন, "জাতীয়ভাব রক্ষা না করিলে—দেশীয় রীতি নীতি রক্ষা না করিলে ধর্ম্ম-সমাজ স্থায়ী হয়না," তাঁহারা মুসলমানসমাজ দেখিয়া কি উক্ত কথার অযৌক্তিকতা অনুভব করিতে পারেননা? আজ যিনি শিখাধারী, মালা তিলকধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কাল তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অন্যরূপে প্রকাশিত হইবেন। তাঁহার বাহ্যবেশও পরিবর্ত্তিত হইবে, তিনি যে কখন হিন্দু ছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতেও পারিবেন না। মুসলমানগণ এদেশে আগমন করিলে কত হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা

এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব জাতীয়চিহ্ন বিন্দু-মাত্রও নাই।

মুসলমান জগতের এই সম্মিলনের মধ্যে অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ এবং মধ্যবর্ত্তিতার ত হাত আছেই, জোর জবরদস্তিও আছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহাদের মধ্যে যে এক বিশ্বব্যাপীসম্মিলন রহিয়াছে, তাহার শোভা অতি চমৎকার। মুসলমানসমাজে অনেক কুনিয়ম আছে সত্য; কিন্তু মৈত্রীভাব যেমন তাহাদের মধ্যে কার্যাতঃ সাধিত হইতেছে, তাহা সুসভ্য খ্রীষ্টানসমাজেও হয় নাই। ইংরাজখ্রীষ্টান ও কাফ্রিখ্রীষ্টানের সহিত প্রায় ব্রাহ্মণ-শূদ্রবৎ পার্থক্য বিদ্যমান। অতি সভ্য আমেরিকাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ।

মুসলমানধর্ম্ম, জগতে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দেখাইবেন। ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে জগতের সকল নরনারীকে এক মহাসূত্রে বন্ধন করিবার জন্য ইচ্ছুক। জাতীয়তাব গণ্ডী দিয়া কেহ পৃথক থাকিতে চাহিলে, তিনি এই সমাজের প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবেন না।

বিবাহ-প্রণালী—অনেক স্থলেই ব্রাহ্মগণ স্বদেশ-প্রচলিত বিবাহ-প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেননা। এ দেশে বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ব্রাহ্ম এই প্রথাকে পাপ বলিয়া মনে করেন। অপরদিকে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেননা। মুসলমানব্রাহ্মও স্বীয় প্রাচীন সমাজের প্রথা অবলম্বন করিতে সম্মত নহেন। ইহা ভিন্ন বিবাহবিষয়ে নানাস্থানে অতি কুৎসিত নিয়ম সকল প্রচলিত আছে। মালবারের নায়র জাতীয় লোকের মধ্যে বিবাহ-প্রথা

নাই—সেখানে স্বেচ্ছাচার প্রচলিত। নায়রদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সেই দেশ-প্রচলিত পথাচার কি অবলম্বন করিবেন ?

দায়াধিকার—দায়াধিকারপ্রথাও নানাদেশে নানা প্রকার প্রচলিত আছে। ব্রাহ্ম যদি স্বীয় বিচার-শক্তিদ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হন যে, তাঁহার স্বদেশীয় দায়াধিকার ব্যবস্থা অতি অশান্তিজনক এবং অসম্পূর্ণ, তবে কি তাহা পরিত্যাগ করিয়া নব মনোনীত কোনও পন্থা অবলম্বন করিবেননা ? এ দেশের ব্রাহ্মগণ এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন দায়াধিকারপ্রথা পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান সকল সমাজের দায়াধিকার প্রথাই যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে, তাহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন।

মুসলমান সমাজের দায়াধিকারপ্রথার কুফল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কত মুসলমান জমিদার বংশ দায়াধিকার বিভ্রাটে পড়িয়া ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই কত মুসলমান ধনী অনিচ্ছাসত্ত্বেও জ্যেষ্ঠভ্রাত, খুল্লভ্রাত-ভগিনীকে বিবাহ করেন, এবং এই জন্য আরও কতরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্ মুসলমানব্রাহ্ম সেই দায়ভাগপ্রথা অনুসারে চলিতে ইচ্ছুক হইবেন ?

নায়র জাতীয় লোকের মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে, ভাগিনের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। নায়রব্রাহ্ম কখনও এই দায়ভাগে সন্তুষ্ট হইবেন না। হিন্দু দায়ভাগ অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে-স্ত্রীজাতির সম্পত্তিতে কোনই সত্ব নাই।

স্থল বিশেষে স্ত্রীলোক সম্পত্তির রক্ষক হইতে পারেন; কিন্তু ইচ্ছাক্রমে দান বিক্রয়ের তাঁহার অধিকার নাই। ব্রাহ্ম কি কথনও এই রূপ অন্যায় দায়াধিকারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন?

গার্হস্থ্যজীবন—জল-বায়ুভেদে—দেশভেদে লোকের গার্হস্থ্যজীবন বিভিন্ন হইয়াছে। যে বিষয়ে প্রকৃতির হাত আছে, কেহই তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না; কিন্তু যেখানে মানুষের হাত, তাহা মানুষ পরিবর্ত্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে।

হিন্দু ও মুসলমানসমাজ স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম কি তেমনি করিতে পারেন? স্ত্রীলোক আজীবন অন্তঃপুরবাসিনী—কারাবরোধবাসিনী, তাঁহার শিক্ষার, উন্নতির কোনই উপায় নাই, মুখ ফুটিয়া কথা কহিবারও পথ নাই। তাঁহারা ধন ধান্যের ন্যায় পুরুষদিগের নিকট পদদলিত হইয়া থাকে। হিন্দু বিধবা নারীর দুর্দ্দশার কথা ভাষায় বর্ণিত হয় না। হিন্দু ও মুসলমান নারীগণের স্বাধীনভাবে কোনও কার্য্য করিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্ম কথনও এইরূপ গার্হস্থ্যজীবন অবলম্বন করিয়া সুখী হইতে পারেন না। যে গৃহে স্ত্রীলোক ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ৭, ৮ বৎসরের বিধবা কন্যাটী একাদশীর দিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে থাকে, আর তাহার পিতা মাতা দুইবেলা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করেন; যে গৃহে বহু সপত্নিক নারী সর্ব্বদা অশ্রুবিসর্জ্জন করে, সেই গার্হস্থ্যজীবন লাভ করিবার জন্য কোন্ ব্রাহ্ম লালায়িত হইবেন?

অনেকের নিকটেই শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের জাতীয়-

পোষাক রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের জাতীয়পোষাক কি? ব্রাহ্মণ গণ যখন কান্যকুব্জে ছিলেন, তখন তাঁহাদের পোষাক ছিল পাজামা, অঙ্গরাখা এবং উষ্ণীষ। তাঁহারা জলময় বঙ্গদেশে আসিয়া, এদেশীয় লোকের পোষাক গ্রহণ করিলেন। এখন যদি কেহ কান্যকুব্জ দেশের পোষাক—পূর্ব্ব পুরুষগণের পোষাক গ্রহণ করেন, তবে কাহারও অট্টহাস্য করিবার অধিকার আছে কি?

যখন যুবরাজ প্রিন্স্ অব ওয়েলস এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্যকুলশ্রেষ্ঠ-বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে"—"কোনও প্সেশীয়েলের পত্র" উল্লেখে একটী বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই, যুবরাজের সহিত যে সকল পারিষদ আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক জন পারিষদ বিলাতের কোনও সংবাদ পত্রে এ দেশের পোষাক সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"এ দেশের লোকে কেহ কেহ আমাদের ন্যায় পোষাক পরে, কেহ কেহ নগ্ন থাকে, কেহ কেহ কাহার মত পোষাক পরিবে তাহা অনুকরণ করিতে না পারিয়া কাপড়গুলি কোমরে জড়াইয়া রাখে।" শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই ধুতি চাদর পরা বাঙ্গালী!

বাস্তবিক ধুতি চাদর প্রকৃত পোষাকের যোগ্য নহে। মহাজনের খাতালেখা কিম্বা আফিসের কেরাণীগিরি অথবা তাকিয়া ঠেস দিয়া গল্প করা ভিন্ন এই পোষাকে কোনই কঠিন শারীরিক কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতে পারে না। বাতাসের সময় ঘরের বাহির হইলে এই পোষাকে লজ্জাও নিবারণ হয় না। যুদ্ধ করা ত দূরের কথা—এ পোষাক পরিয়া আহার

পরিচালন, ইঞ্জিনিয়ারের কাজ, জরিপের কাজ, বনবিভাগের কাজ, গভীর বনে প্রবেশ করিয়া খনি অনুসন্ধান প্রভৃতি কোনও কঠিন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর ঈষৎ সংস্পর্শে, কণ্টক লতিকার ঈষৎ আঘাতে যে ধুতি খানা কোমর হইতে খুলিয়া যায়, তাহা লইয়া কি কোনও গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে? আমাদের এই পরিচ্ছদ-প্রণালী যদি কেহ সংস্কার করিতে চাহেন, তবে জাতীয়তার দোহাই দিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা কি কর্ত্তব্য? বাস্তবিক এদেশের কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, পোষাক সম্বন্ধে সকলেরই অতি হীনাবস্থা। স্ত্রীলোকেরাও অতি পাতলা কাপড় পরিয়া থাকেন।

এ দেশের সূতিকাগৃহ এবং প্রসূতির প্রতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণ কি প্রাচীন-প্রথা অবলম্বন করিতে পারেন? হিন্দু-সমাজের সূতিকা ঘর গুলি যমালয়স্বরূপ। সূতিকাগৃহ হইতে প্রসূতি যখন বাহির হন, তখন তাঁহার হাড় কখানি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এ বিষয়ে জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া ব্রাহ্মগণ কি সুবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন না?

মাতৃভাষা—মাতৃভাষা জাতীয়ভাবের—দেশীয়ভাবের একটী প্রধান চিহ্ন। মাতৃভাষা কখনও পরিত্যাজ্য নহে—মাতৃভাষার উন্নতি না হইলে কখনও জাতীয় উন্নতি হয় না—হইলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। বর্ত্তমান সময়ে জাপান দ্রুতগতি উন্নতির পথে গমন করিতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি জাপান-ভাষার উন্নতি সাধিত না হয়, তবে এই উন্নতি-স্রোত চির প্রবহমান থাকিবে কিনা সন্দেহ। শিশু মাতৃ-স্তন পানের সহিত যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে শিখে, সে ভাষায় তাহার প্রথম

জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, সেই ভাষার উপরে তাহার মানসিক শক্তির উন্নতি অবনতি প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে।

বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী বিশেষ পরীক্ষিত বিষয় যে, মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন না হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কখনও হয় না। এজন্য নানা দেশের চিন্তাশীল মনস্বিগণ পৃথিবীর নানা-বিধ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া অনুবাদের দ্বারা সেই সকল ভাষার জ্ঞানরাশি স্বীয় স্বীয় মাতৃভাষায় আনয়ন করিতেছেন। ইয়ু-রোপীয় ভাষা সমূহ পরিপুষ্ট হইবার ইহা একটী প্রধান কারণ।

এ দেশে এমন অনেক ইংরাজি-শিক্ষিত এবং সংস্কৃত-শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা মাতৃভাষা—বঙ্গভাষাকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন না। টোলের পণ্ডিতগণ অনেকেই বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না,—চেষ্টাও করেন না—বঙ্গভাষা তাঁহাদের কাছে অবজ্ঞার জিনিস। অপর দিকে "যাঁহারা কাল চামড়ার দায়ে পড়িয়া নানা প্রকার সাফাই তালাস করিতেছেন," সেই সকল ইংরাজি-নবিশেরা মাতৃভাষার সহিত যত দূর পারেন, সম্বন্ধ বিনাশ করিতেছেন। তাঁহারা যেন বাঙ্গালায় কথা বলিতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত। তাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করেন না—বাঙ্গালাতে চিঠি পত্রাদিও লেখেন না। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে মহির্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় যে, এই মহোপকারী জাতীয়তার দিকে লোকের তেমনি দৃষ্টি নাই। "আর্য্য আর্য্য" বলিয়া যাঁহারা গৌরব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দেখিতেছি, কেহ কেহ পিতার নিকটেও ইংরাজিতে চিঠি লিখিয়া থাকেন। যদি বা

দৈবাৎ বাঙ্গালা লেখেন, তবে বুঝা যায় না যে, তিনি বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, কি বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি লিখিয়াছেন!

বঙ্গভাষাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা ও ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে অভ্যুদিত হইয়াছে, ইহার গ্রন্থাবলী এই ভাষায় লিখিত। বিশেষ এই ভাষাকে মহাত্মা রামমোহন সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সকল দেশীয় ব্রাহ্মের নিকটেই বঙ্গ-ভাষা ভক্তির বস্তু।

বিদেশীয় ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া মাতৃভাষাও সংস্কৃত হয়। নূতন নূতন শব্দ, নূতন নূতন ভাব প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলে। পার্শিভাষা, হিন্দি ভাষার সহিত মিলিত হইয়া উর্দ্দু ভাষাকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই উর্দ্দু ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইলেও হিন্দুস্থানের ক্ষতি হয় না। তৎস্থলে বঙ্গভাষাকে যদি পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ গ্রহণ করেন, তবে ভারতের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু মূল ভাষা— মাতৃভাষা কখনও পরিত্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। রেওয়ার নূতনরাজা, সম্প্রতি গদিতে বসিয়াই উর্দ্দু ভাষা স্থলে হিন্দি প্রচলিত করিয়াছেন।

প্রচার—এখন প্রচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে।" "জাতীয় ভাবে প্রচার করিতে হইবে," ইহার অর্থ বড়ই দুরূহ। আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার জাতীয়ভাব ত এই যে, জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলা, বিগ্রহ সেবা করা, কৃষ্ণ বিষ্ণুকে মানা, বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রচারে ইহার কোনটীই গৃহীত হইতে পারে না। আর একটা দৈহিক জাতীয়ভাব আছে, তাহা এই;—শিখা রাখা, চটি পরা, মালা ও তিলক ধারণ করা। অন্য প্রকার মূর্ত্তি এই—রিক্তপদ হওয়া, গৈরিকবসন পরা বা গৈরিক আলখাল্লা গায়ে দেওয়া। ইহার কোনটীই প্রচারের পন্থা নহে। শিখা তিলকের সহিত যেমন হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, গৈরিকের সহিতও তেমনি যোগ রহিয়াছে। শিখা, তিলক ত ব্রাহ্ম ধারণ করিতে পারিবেনই না। গৃহস্থব্রাহ্ম গৈরিক পরিধান করিতেও পারেন না। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপরায়ণ—কেবল তিনিই গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিবার অধিকারী। গৃহীব্রাহ্ম—বিবাহিতব্রাহ্ম যদি গৈরিক অবলম্বন করেন, তবে কি তিনি নিজের ব্যবহারদ্বারা সকলকে ভুল বুঝাইবেন না?

আজ কাল এদেশে গৈরিকানুরাগের মাত্রা কিছু বাড়িয়াছে। ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে, গৈরিক চাই; রেলে নানাস্থানে বেড়াইতে হইবে, গৈরিক দরকার; রাজনীতি প্রচার করিতে হইবে—কংগ্রেসের টাকা আদায় করিতে হইবে,গৈরিক চাই; ফিকির চাঁদ ফকিরের গান গাইতে হইবে, গৈরিকে সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন; এমনকি খ্রীষ্টানগণ ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, তাহাও গৈরিকবেশে! এইরূপে বালক, বৃদ্ধ, যুবা অনেকেই গৈরিক-হুজুগে মাতিয়াছে। এখন হইতে ইহার প্রতীকার আরম্ভ না হইলে- সম্ভবতঃ—"সব্ লাল হো যায়গা।"

জাতীয়ভাবে প্রচারের অর্থ জাতীয়ভাষায় প্রচার, ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মশাস্ত্রে জাতীয়ভাবের কোনও অর্থ নাই। যে সকল দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন করিলে শ্রোতৃমণ্ডলী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা অতি সরলভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমূহ বিবৃত করিতে হইবে।

প্রচার দ্বিবিধ। প্রথম জীবনদ্বারা প্রচার, দ্বিতীয় তত্ত্ববিদ্যা (থিওলজি) প্রচার। "জীবনে জীবন গড়ে" ইহা একটী পুরাতন কথা। একজন প্রকৃত ধার্ম্মিকের সংস্পর্শে আসিয়া দশটী পাপাত্মা স্বর্গের পথে গমন করে, ইহাই উৎকৃষ্ট প্রচার এবং এইরূপে যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ প্রচারক। শাক্যসিংহ, যীশু, মহম্মদ, এই শ্রেণীর প্রচারক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রচারক—তত্ত্ববিদ্যা প্রচারক, তাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্ব—জ্ঞানের কথা—বিজ্ঞানের কথা প্রচার করেন। সক্রেটিস্, শঙ্করাচার্য্য এই শ্রেণীর প্রচারক। ব্রাহ্ম প্রচারকের মধ্যে এই দ্বিবিধ গুণই থাকা বাঞ্ছনীয়। মত প্রচারের জন্য বক্তৃতা—কথকতা—আলাপ ইত্যাদি এবং স্কুল কলেজ স্থাপনদ্বারা শিক্ষা দান; জীবনদ্বারা প্রচারের জন্য মণ্ডলী গঠন—আশ্রম স্থাপন—একস্থানে দীর্ঘকাল বাস ইত্যাদি উপায় অবলম্বনীয়।

কেহ কেহ বলেন, "যখন যে দেশে প্রচার করিতে যাইবে, সেই দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে হইবে।" ইহাতে দোষ গুণ দুইই আছে। দেশীয়শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিলে লোকে অতি সহজে সত্য গ্রহণ করিতে পারে; দোষ এই যে, এরূপ হইলে সার্ব্বভৌমিকব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। লোকে বিদেশীয় সাধুদিগের প্রতি ভক্তি এবং বিদেশীয় শাস্ত্রনিহিত সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিবে না এইরূপ প্রচার করিলে অপরদিকে অত্যন্ত অনি-

ইও হয়। তাহা এই ;—মনে করুন, কোনও প্রচারক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রধান স্থানে প্রচার করিতে গিয়া ভারতীয়শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা জাতিভেদ, সাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিলেন। বক্তৃতার পরে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে অভিজ্ঞ লোকেরা উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ আপনি যাহা বলিলেন, তাহাও সত্য, অপর দিকে সাকারোপাসনা জাতিভেদও সত্য। শাস্ত্রে দুই পন্থাই আছে। কিন্তু প্রথম পথ অর্থাৎ সাকার অবলম্বন না করিলে কেহ নিরাকারে যাইতে পারে না।" তৎপর দুর্ব্বল, সবল অধিকারভেদের কথা উঠিল, চিরপ্রচলিত ভারতীয় অদ্বৈতবাদ আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। হিন্দুশাস্ত্রের বিচার চলিল—বিচারে যাহা হয়, তাহাই হইল। হিন্দুপক্ষ স্বীয় স্বীয় মত সমর্থন করিয়া ঘরে গেলেন।

দেশীয়শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রচার করিলে পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। ইহার উদার সার্ব্বজনিকভাব লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। প্রচারও হইবে না—বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া প্রচার করিলে, কেহই উপবীত ত্যাগ করিবে না, অসবর্ণ বিবাহ করিবে না। এইরূপে প্রচারের আশা নাই ; আদিসমাজ জাতীয়ভাবেই প্রচার করেন ; কিন্তু তাঁহারা লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন কি ? আসল কথা এই, মৃতশাস্ত্র—গ্রন্থরাশি কখন জীবন্ত ধর্ম্মপ্রচারের উপায় হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে জাতীয়ভাবের, হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু চিন্তাশীল দেশীয়গণ

ইতিমধ্যেই ইহার অপকারিতা অনুভব করিতেছেন। এক জন হিন্দুলেখক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুনুন ;—"হিন্দুধর্ম্মে যে আমরা স্ব-মস্তিষ্ক-কল্পিত নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমরা বিশ্বাসটী হারাইয়াছি। ইয়ুরোপেও, বিজ্ঞানকর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে আক্রান্ত হইয়া খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম যাজকগণ বাইবেলের এইরূপই নূতন অর্থ বাহির করিতেছেন। তাহাতে প্রভূত পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য ধীশক্তি এবং গভীর গবেষণা দর্শিত হইতেছে সত্য ; কিন্তু তাহা সে লুপ্ত বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে পারে না। ধর্ম্মের প্রকৃত বিশ্বাস, উৎসের ন্যায়, স্বতঃই মাটি খুঁড়িয়া উঠে, স্বতঃই প্রবাহিত হয় ; তাহাকে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয় না। যখন চেষ্টা করিয়া টানিয়া আনিতে বা ধরিয়া রাখিতে হয়, তখন আর আসল বিশ্বাস নাই। * * যখন ধর্ম্মের এই অবস্থা, তখন সেটি তাহার অন্তিমকাল। বিশ্বাস যদি না হারাইয়া থাকি—তবে এ সব ব্যাখ্যা, এ সব যুক্তি, এ সব তর্ক কেন?" এই লেখক ঠিক অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন।

IMPERIAL LIBRARY

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ কলিকাতা ২১০/৬ কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট্ সাধনাশ্রমে, এবং ২১১ নং: কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট্ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাওয়া যায়।

চরিত-রত্নাবলী	...	...	...	।০
পুণ্যকাহিনী	...	...	...	।৶০
পুণ্যদাপ্রসাদ	...	...	...	৶০
চরিত-মুক্তাবলী	...	...	...	॥০
চরিত-কুসুমমালা	...	...	...	।০
তত্ত্ব-পরিমল	...	...	...	॥০